ইউনিট

৭ প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। এর আগে সমগ্র উত্তর ভারতে ছিল বিভিন্ন গোত্রভিত্তিক বা উপজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে সৃষ্টি হয় জনপদের এবং এই সময়ে ষোলটি প্রধান জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব জনপদের মধ্যে একটি, মগধ জনপদ, ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। মগধের এই অগ্রযাত্রা থেকেই সূচিত হয় উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের দৃষ্টান্ত। এই সূচনা থেকেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে প্রয়াসী হন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যই ভারতের ইতিহাসে প্রথম বিশাল সাম্রাজ্য। মহামতি অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে মানবতার নীতি সমন্বয়ে দৃঢ় করতে সক্ষম হন। মৌর্য যুগেই সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। রাজ্য শাসন ব্যবস্থার মৌল কাঠামো এই যুগেই নির্ধারিত হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে কুষাণ যুগে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। বহিরাগত কুষাণ বংশ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে কুষাণ সাম্রাজ্য। কুষাণ সাম্রাজ্যকে এক অর্থে বলা চলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস।

পরবর্তী বৃহৎ সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য, যার কেন্দ্র ছিল মৌর্যদের মতো পূর্ব ভারতেই। মগধকে কেন্দ্র করেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অগ্রযাত্রা। সমুদ্রগুপ্তের ব্যাপক সম্প্রসারণ নীতির সাফল্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে প্রাচীন ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজা। বিশাল সাম্রাজ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ও বহির্বাণিজ্যভিত্তিক সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থা এই যুগকে করে তোলে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে এই যুগের অগ্রগতিকে লক্ষ করেই ইতিহাসে এই যুগ 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শেষ অধ্যায় সূচিত হয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। পূর্ব পাঞ্জাবের থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের মধ্যদেশের মৌখরী বংশের সাম্রাজ্য একত্রিত করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমগ্র উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য। পুষ্যভূতি মৌখরী সাম্রাজ্যেরও ধর্ম-সংস্কৃতির, শিক্ষা-দীক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী প্রায় এক হাজার বছরের মধ্যে চারটি বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিটি সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালে উত্তর ভারত ভেঙ্গে পড়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বারংবার উত্তব ভারতের ইতিহাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতেই সক্ষম হয়েছিল। প্রশাসন ব্যবস্থার সুবিন্যাস, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্প-সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি এই সাম্রাজ্যগুলির ইতিবাচক দিক। রাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল এই সাম্রাজ্যগুলিকে ভিত্তি করেই।

পাঠ ১

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দের 'ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মগধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ষোড়শ মহাজনপদ

ষোড়শ মহাজনপদ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ই প্রথমবারের মতো ভারতে বড় বড় রাজ্য গঠনের আভাস পাওয়া যায় এবং একই সাথে তাদের মধ্যে চলে শক্তি সংগ্রহ ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রাচীন ভারতের কিছু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেই সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যা ছিল 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলে পরিচিত। অখন্ড সর্বভারতীয় কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের উত্থান পর্যন্ত সময়কে 'ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ষোড়শ মহাজনপদের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত এজন্য যে, কিভাবে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির সংঘাতময় অবস্থা থেকে মগধের নেতৃত্বে অখন্ড সর্বভারতীয় রাজশক্তির শাসনে এলো তা বুঝা যাবে। প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের এই বিকাশ প্রক্রিয়ার পথে মৌর্য রাজবংশই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাচীন ভারতের কিছু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেই সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যা ছিল 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলে পরিচিত

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে মগধকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক তৎপরতার ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে। জৈন 'ভগবতীসূত্র' এবং বৌদ্ধ 'অঙ্গুত্তরনিকায়' নামক দুটি গ্রন্থে ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় এবং মগধের নেতৃত্বে সেগুলির ঐক্যবদ্ধ হবার তথ্য পাওয়া যায়। উত্তরে কাবুল থেকে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে রাজ্যগুলির কথা জানা যায় সেগুলি হচ্ছে কাম্বোজ, গান্ধার, কুরু, কোশল, শূরসেন, পাঞ্চাল, মল্ল, বৃজি বা বজ্জি, মৎস্য, চেদী, বৎস, কাশী, অঙ্গ, অবন্তী, অশ্বক ও মগধ। এই ষোলটি রাজ্য প্রায়ই প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। ক্রমেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনপদগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে চারটি রাজ্য প্রধান হয়ে ওঠে। এই রাজ্যগুলি হচ্ছে কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ। ভারতের খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস হচ্ছে এই বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস এবং মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বর্তমান বিহারের দক্ষিণাংশ, মুখ্যত পাটনা ও গয়া জেলা, প্রাচীনকালে মগধ নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল নানা জাতির মিশ্রিত জনবসতি। বিভিন্ন কারণে ভারতের ইতিহাসে এই মগধের গুরুত্ব যথেষ্ট। মগধের ভৌগোলিক অবস্থান এর শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। মগধের মাঝখান দিয়ে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা। মগধ রাজ্যও ছিল বেশ সুরক্ষিত। গঙ্গা, শোন ও গন্ডক নদী এর রাজ্যকে তিনদিক থেকে ঘিরেছিল। এর ফলে কোন শত্রুদেশের পক্ষে সহসা মগধ আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। এ রাজ্যের আদি রাজধানী ছিল খুবই সুরক্ষিত স্থান। এর চারদিকে ছিল পাহাড় এবং পাথরের উঁচু প্রাচীর। মগধের পরবর্তী রাজধানী পাটলীপুত্রও ছিল সুরক্ষিত। এমনি ধরনের অবস্থানগত ভৌগোলিক সুবিধার জন্য মগধ সহজে প্রতিবেশীদের আক্রমণ করতো; কিন্তু মগধকে প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ করতে পারেনি। ঐতিহাসিক ব্যাশাম, রোমিলা থাপার প্রমুখ গঙ্গা নদীর উপর মগধের নিয়ন্ত্রণ এবং মগধের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির উল্লেখ করে বলেন, মগধ রাজ্যের রাজবংশগুলির নেতৃবৃন্দ খুব সহজেই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় জড়িত এবং সফল হতে পেরেছিলেন।

উত্তরে কাবুল থেকে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে রাজ্যগুলির কথা জানা যায় সেগুলি হচ্ছে কাম্বোজ, গান্ধার, কুরু, কোশল, শূরসেন, পাঞ্চাল, মল্ল, বৃজি বা বজ্জি, মৎস্য, চেদী, বৎস, কাশী, অঙ্গ, অবন্তী, অশ্বক ও

বর্তমান বিহারের দক্ষিণাংশ, মুখ্যত পাটনা ও গয়া জেলা, প্রাচীনকালে মগধ নামে পরিচিত ছিল

মগধের প্রাধান্য

মৌর্যদের পূর্বে দুটি বিখ্যাত রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন বলে জানা যায় - এগুলি হলো হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশ এবং নন্দ বংশ। হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের বিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দ ও ধননন্দ হচ্ছেন প্রসিদ্ধ রাজা। বিম্বিসার (৫৪৫ বা ৫৪৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) মগধের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির বীজ বপন করেন। গোষ্ঠী শাসিত সৈন্যদল ভেঙ্গে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ তাঁর অনুগত এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। সামরিক সংগঠন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিম্বিসার জোরালোভাবে রাজ্য বিস্তার চালিয়ে যান। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে বিম্বিসারকে হত্যা করে তাঁরই পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মতোই রাজ্য বিস্তার নীতি অক্ষুন্ন রাখেন। কোশল রাজ্যের সাথে মগধের যুদ্ধ অজাতশত্রুর শাসনকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার উপর বাণিজ্যিক আধিপত্য নিয়েই মগধ কোশলের লড়াই হয় বলে ঐতিহাসিক ব্যাশাম মনে করেন। এভাবে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মগধের সাম্রাজ্যসীমা অনেক দূর বাড়িয়ে দেন। গঙ্গা ও তার শাখা নদীর উপর মগধের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের শিম্বিসার, অজাতশত্রু এবং নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দ ও ধননন্দ হচ্ছেন প্রসিদ্ধ রাজা

বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে বিম্বিসারকে হত্যা করে তাঁরই পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসেন।

হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের পর মহাপদ্মনন্দ প্রতিষ্ঠা করেন নন্দ বংশের শাসন। গ্রিক সূত্রে এই রাজাকে 'আগ্রামেস' বলা হয়েছে। তাঁকে 'সর্বক্ষত্রিয়োচ্ছেত্তা' বা সকল ক্ষত্রিয় রাজার উৎখাতকারী হিসেবেও আখ্যা দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ সূত্র মতে, তিনি ছিলেন 'উগ্রসেনা' বা ভয়ংকর সেনাদলের অধিপতি। মহাপদ্মনন্দ কেবল বিজেতা ছিলেন না। সাম্রাজ্যের সংগঠক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব দেখান। তিনি মহাপাত্র, প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি কর্মচারিদের মাধ্যমে সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করেন। খারবেল শিলালিপিতে মহাপদ্মের কিছু জনহিতকর কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ধননন্দ ছিলেন নন্দবংশের সর্বশেষ রাজা। তিনি অত্যাচারী এবং অর্থলিপ্সু হিসাবে ইতিহাসে নিন্দিত। যতোদূর জানা যায়, ২০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক, ২ হাজার রথ ও ৩ হাজার রণহস্তী নিয়ে গঠিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ধননন্দ করের হার বৃদ্ধি করেছিলেন। অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে জানা যায়।

হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের পর মহাপদ্মনন্দ প্রতিষ্ঠা করেন নন্দ বংশের শাসন।

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যকরণের প্রয়াসে মগধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যকরণের প্রয়াসে মগধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি ক্ষুদ্র রাজ্য হতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য রূপে মগধের উত্তরণের মূলে ছিল বিম্বিসার থেকে মহাপদ্মনন্দ পর্যন্ত বিভিন্ন শাসকের সামরিক কৃতিত্ব ও রাজনৈতিক যোগ্যতা। কিন্তু শেষ দিকে নন্দ রাজাদের নৈতিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অযোগ্যতা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কৌটিল্য এর পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নন্দ বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রাচীন ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

সার-সংক্ষেপ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দে ভারতে কোন অখন্ড সর্বভারতীয় রাজ্য ছিল না। এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ১৬টি রাজ্য বা ষোড়শ মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক যোগ্যতাবলে মগধ বৃহৎ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ক্রমেই মগধের নেতৃত্বে প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা বিকাশ লাভ করে। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশও তরান্বিত হয়। এমনি ধরনের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ শুরু হয়–
ক. খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে।
খ. খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে।
গ. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।
ঘ. খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে।

২। প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ হয় যে রাজ্যকে কেন্দ্র করে তার নাম–
ক. অবন্তী।
খ. গান্ধার।
গ. কাম্বোজ।
ঘ. মগধ।

৩। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে যে চারটি রাজ্য প্রধান হয়ে ওঠে, সেগুলো হচ্ছে–
ক. কোশল, মল্ল, মগধ ও কুরু।
খ. কোশল, মৎস্য, মগধ ও বৎস।
গ. কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ।
ঘ. কোশল, গান্ধার, অবন্তী ও মগধ।

৪। বিম্বিসার রাজা ছিলেন–
ক. মৌর্য বংশের।
খ. নন্দ বংশের।
গ. হর্যঙ্ক-শৈশুনাগ বংশের।
ঘ. গুপ্ত বংশের।

৫। 'সর্বক্ষত্রিয়োচ্ছেত্তা' উপাধিধারী রাজার নাম–
ক. অজাত শত্রু।
খ. বিম্বিসার।
গ. মহাপদ্মনন্দ।
ঘ. ধননন্দ।

৬। রাজ্যের বিরুদ্ধে অজাতশত্রু যুদ্ধ করেন–
ক. অবন্তী।
খ. কোশল।
গ. কাম্বোজ।
ঘ. গান্ধার।

৭। রাজার কাছ থেকে মৌর্যরা ক্ষমতা লাভ করেন–
ক. ধননন্দ।
খ. মহাপদ্ম নন্দ।
গ. উদয়ভদ্র।
ঘ. শিশুনাগ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রূপে মগধের অভ্যুত্থান আলোচনা করুন।
২. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখপূর্বক মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন।

পাঠ ২

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতের প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ ধারা সম্পর্কে আপনারা আগের পাঠে জেনেছেন। আরো জেনেছেন মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট। এই মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তাঁর রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নৃপতি হিসেবে তাঁর আসন ইতিহাসে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই প্রাচীন ভারতে অখন্ড ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম বড় ধরনের সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সময় থেকেই সর্বভারতীয় চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটে, মৌর্য শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসার বাড়তে থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রে আর্য-অনার্যের পার্থক্য ক্রমেই ঘুঁচে যেতে শুরু করে এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই মৌর্য যুগের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অবদানও অনস্বীকার্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই প্রাচীন ভারতে অখন্ড ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম বড় ধরনের সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্পর্কে জানার জন্য বেশ কয়েকটি উৎস রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিরিয়ার গ্রিক রাজা সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থ, কিছু লিপি এবং অপর বেশ কিছু বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত উৎস থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালীন ভারত সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

প্রথম জীবন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন সূত্রে জানা যায়- তিনি শূদ্র গর্ভজাত; আবার অপর কিছু সূত্রে উল্লেখ আছে তিনি 'মোরিয়' নামক ক্ষত্রিয় বংশজাত। দ্বিতীয় মতামতই ঐতিহাসিকদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। একাধিক সূত্র বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে, প্রথম জীবনে চন্দ্রগুপ্ত বেশ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটান। শৈশবে এক সীমান্ত যুদ্ধে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে এং মায়ের সাথে তিনি পাটলীপুত্রে আসেন। এখানে তিনি গো-চারণ কাজে নিয়োজিত হন। কথিত আছে, চাণক্য (মতান্তরে কৌটিল্য) নামক একজন ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে তক্ষশীলায় নিয়ে যান এবং সামরিক ও রাষ্ট্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। এরপর চন্দ্রগুপ্ত পুনরায় আসেন পাটলীপুত্র নগরীতে। এখানে তখন শাসন করছিলেন নন্দরাজ ধননন্দ। ধননন্দের অত্যাচারে জনসাধারণের মধ্যে সেসময় প্রচন্ড ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। ধননন্দের বিরুদ্ধে গ্রিকদের সাহায্য কামনা করে চন্দ্রগুপ্ত ব্যর্থ হন। মগধের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চাণক্যের সহায়তায় অচিরেই এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ধননন্দের সৈন্যদের সঙ্গে প্রথম দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তৃতীয়বারের যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র অধিকার করেন। এভাবেই নন্দবংশের শাসন উচ্ছেদ করে মগধে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি ঠিক কোন্ বছর সিংহাসনে বসেছিলেন নিশ্চিত করে তা বলা যায় না। তবে মনে করা হয়, আলেকজান্ডারে মৃত্যুর কাছাকাছি কোন এক সময়ে তিনি হয়তো মগধের সিংহাসনে বসেন।

নন্দবংশের শাসন উচ্ছেদ করে মগধে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা করেন চন্দ্র-গুপ্ত মৌর্য।

সাম্রাজ্য সীমা

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যসীমাকে বিস্তৃত করার দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ব দিকে তিনি বাংলা থেকে শুরু করে পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে নর্মদা বা বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। কয়েকটি তামিল উৎস থেকে অনুমিত হয়, তিনি সম্ভবত ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তেও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন ভারত থেকে গ্রিকদের বিতাড়ন করার ব্যাপারে উদ্যোগী। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলুকাস খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে গ্রিক আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। এসময় চন্দ্রগুপ্তের সাথে সেলুকাসের সংঘর্ষ হয় এবং যতোদূর জানা যায়- সেলুকাস এ যুদ্ধে পরাস্ত হন। যুদ্ধের কোন বিস্তারিত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু গ্রিক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো কেবলমাত্র সন্ধি স্বাক্ষরের কথা উল্লেখ করেছেন। যা প্রকারান্তরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জয়লাভেরই ইঙ্গিতবাহী। সেলুকাসের পরাজয় অর্থাৎ ভারতে গ্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে চন্দ্রগুপ্ত প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে পশ্চিম ভারতের মালব ও সৌরাষ্ট্র তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

পূর্ব দিকে তিনি বাংলা থেকে শুরু করে পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে নর্মদা বা বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন।

এইভাবে প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

শাসন ব্যবস্থা

কেবলমাত্র বিজেতা হিসেবেই নয়, সাম্রাজ্য সংগঠক ও শাসক হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে প্রজাকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটান। 'প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য' সংক্রান্ত ধারণা চন্দ্রগুপ্ত তাঁর শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সারাদিন রাজসভায় বসে প্রজাদের আর্জি শুনতেন ও বিচার করতেন। প্রজাদের মঙ্গল বিধানকে তিনি 'রাজকর্তব্য' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর আমলে সম্ভবত ৪টি প্রদেশ ছিল। প্রদেশগুলি আবার বিভক্ত ছিল কয়েকটি জেলা বা বিষয়ে। সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কেন্দ্রের সাথে প্রদেশ ও বিষয়ের কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রজাদের মঙ্গল বিধানকে তিনি 'রাজকর্তব্য' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কৃতিত্ব

যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক ও প্রজাহিতৈষী রাজা হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতীয় সম্রাটগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সামান্য অবস্থা হতে তিনি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হন এবং অত্যাচারী নন্দরাজকে পরাভূত করে সুশৃংখল সাম্রাজ্য গঠন এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। আলেকজান্ডারের রাজ্যবিস্তার প্রয়াসের অবসান ঘটিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত করেন। গ্রিকদেরকে পরাজিত করে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমা পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেন। একই সাথে তিনি গ্রিকদের বন্ধুত্ব অর্জনেও সক্ষম হন। এই বন্ধুত্ব তিন (৩) প্রজন্মকাল স্থায়ী হয়েছিল। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৈদিক যুগ হতে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের যে স্বপ্ন বিদ্যমান ছিল তা সফল করেন। রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করে তিনি তাঁর দিগ্বিজয়কে স্থায়ী রূপ দেন। বিদেশী লেখকগণ পর্যন্ত তাঁর শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও তাঁর অবদান লক্ষণীয়।

যোদ্ধা, সুদক্ষ শাসক ও প্রজাহিতৈষী রাজা হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতীয় সম্রাটগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে চন্দ্রসুপ্ত সর্বপ্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৈদিক যুগ হতে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের যে স্বপ্ন বিদ্যমান ছিল তা সফল করেন।

দেহত্যাগ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্ভবত ২৪ বছর রাজত্ব করেন। জৈন সূত্র থেকে জানা যায় যে, পরপর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ হলে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মহীশূরের শ্রাবণবেলাগোলা নামক স্থানে অনশন করে জৈনরীতিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনিই হলেন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সফল রূপকার। অতি সামান্য অবস্থা হতে উত্তরণ ঘটিয়ে তিনি সাম্রাজ্য নির্মাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবন ও শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গ্রিক শাসন থেকে তিনি ভারতভূমিকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি পূর্বে বঙ্গদেশ বা বাংলা থেকে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তাঁর রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল সুন্দর এবং বিশাল এক প্রাসাদ নগরী। ২৪ বছর রাজত্ব করার পর তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করেন বলে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পুরোধা আসনে অধিষ্ঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'কৌটিল্য' রচিত গ্রন্থটির নাম–
ক. ইন্ডিকা।
খ. অর্থশাস্ত্র।
গ. মুদ্রারাক্ষস।
ঘ. রামচরিতম্।

২। 'মেগাস্থিনিস' ছিলেন–
ক. আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতি।
খ. সেলুকাসের প্রধান সেনাপতি।
গ. আলেকজান্ডারের প্রেরিত দূত।
ঘ. সেলুকাসের প্রেরিত দূত।

৩। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সফল হতে সাহায্য করে–
ক. আলেকজান্ডার।
খ. সেলুকাস।
গ. কোটিল্য।
ঘ. ধননন্দ।

৪। চন্দ্রগুপ্তের সাথে সেলুকাসের যুদ্ধ হয়–
ক. খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে।
খ. ৩০৫ খ্রিস্টাব্দে।
গ. খ্রিস্টপূর্ব ২০৫ অব্দে।
ঘ. ২০৫ খ্রিস্টাব্দে।

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি–
ক. সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করা।
খ. জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা।
গ. সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।
ঘ. জনসাধারণের মধ্যে খাবার বিতরণ করা।

৬। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৃত্যুবরণ করেন–
ক. ভগবান গোলায়।
খ. পাটলী পুত্রে।
গ. শ্রাবণ বেলা গোলায়।
ঘ. তক্ষশীলায়।

৭। চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে–
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শূদ্র গর্ভজাত।
খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ব্রাহ্মণ গর্ভজাত।
গ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ক্ষত্রিয় গর্ভজাত।
ঘ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বৈশ্য গর্ভজাত।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরিচয় দিন।
২. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাথমিক জীবন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।
৩. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

পাঠ ৩

মহামতি অশোক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সম্রাট অশোকের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- অশোক প্রবর্তিত 'ধম্ম' নীতি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন আরোহণ

প্রাচীন ভারত তথা প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অশোক স্বীকৃত হয়েছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামতি অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র, নৃপতি বিন্দুসারের পুত্র অশোক মৌর্যবংশীয় তৃতীয় শাসক। পিতার জীবিতকালে তিনি তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর শাসকরূপে যথেষ্ট প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। সিংহলী উপাখ্যান হতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক নাকি তাঁর সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য ৯৯ জন ভাইকে হত্যা করেছিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্য অশোক তখন 'চন্ডাশোক' নামে অভিহিত হন। ৯৯ জনকে হত্যা করে ক্ষমতা হস্তগত করা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করলেও অন্তত একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সিংহাসন লাভ করতে অশোক উত্তরাধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। বেশ কিছু মূল্যবান উপাদান হতে মহামতি অশোকের ইতিহাস জানা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর শিলালিপিমালা, সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশ' ও 'দীপবংশ', অন্যান্য বৌদ্ধ উপাখ্যান ও গ্রন্থাদি।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামতি অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন।

সিংহলী উপাখ্যান হতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক নাকি তাঁর সিংহাসন নিরাপদ করার জন্য ৯৯ জন ভাইকে হত্যা করেছিলেন।

অশোক স্তম্ভ

কলিঙ্গ জয়

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং বিন্দুসারের পথ ধরে অশোক তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ চালিয়ে যান। রাজ্যাভিষেকের আট বছুর পর অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। তাঁর রাজত্বের সর্বপ্রধান ঘটনা ছিল এই কলিঙ্গ যুদ্ধ। কলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যার উত্তরাংশে গঞ্জাম জেলার কিছু অংশ বোঝায়। কলিঙ্গ আক্রমণের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তিব্বতীয় বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, অশোক দক্ষিণ ভারতে যাবার স্থল ও জলপথকে নিরংকুশ করার জন্যই কলিঙ্গ জয় করেন। তবে অন্যান্য আরো কিছু কারণ অশোককে কলিঙ্গ আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের ধ্যান-ধারণা, রাজ্যশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব ফেলে।

অশোক দক্ষিণ ভারতে যাবার স্থল ও জলপথকে নিরংকুশ করার জন্যই কলিঙ্গ জয় করেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের বিশাল ক্ষয়-ক্ষতিতে অশোকের মনে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি হয় ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোক বলেছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত, দেড় লক্ষ লোক বন্দী এবং আরো বহুলোক শিকার হয় নানারকম দুর্ভোগের। এভাবে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় সত্য, কিন্তু জীবন ও নীতি সম্পর্কে অশোকের মনোভাবে চলে আসে আমূল পরিবর্তন। এরপর থেকে অশোক 'পররাজ্য গ্রহণ নীতি' পরিত্যাগ করেন এবং এর পরিবর্তে সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক অগ্রগতি ও ধর্মপ্রচারের যুগ শুরু হয়। অশোক হয়ে ওঠেন মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তিনিই সর্বপ্রথম রাজকীয় কর্তব্যকে প্রজাগণের প্রতি ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেন। আমলাতন্ত্রনির্ভরতার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকামী করে তোলেন। রাষ্ট্রনীতির উপর কলিঙ্গ জয়ের এই হলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

অশোক বলেছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত, দেড় লক্ষ লোক বন্দী এবং আরো বহুলোক শিকার হয় নানারকম দুর্ভোগের।

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাটের ধর্মান্তরের ফলে রাজপরিবারের চিরাচরিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। রাজ্যের সর্বত্র প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় পশুবলির প্রথাও। মানুষ এবং পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, ধর্ম মহামাত্র নামে নতুন কর্মচারি নিয়োগ, আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান খারাপ কাজ বলে ঘোষণা ইত্যাদির মাধ্যমে অশোক নবরূপে আবির্ভূত হন। কথিত আছে যে, তিনি পাটলীপুত্র নগরীতে বৌদ্ধনীতিসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে এক বৌদ্ধ সংগীতিও আহবান করেছিলেন। অবশ্য মহামতি অশোকের রাজ্য শাসননীতির পরিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার, ডি, ডি, কোশাম্বী প্রমুখ মনে করেন, নতুন নীতি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ছাড়া অন্য উপায়ে সাম্রাজ্যের সংগঠনকে মজবুত করা। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতায় অশোক প্রকৃতপক্ষে কতোটুকু মানবিক হয়েছিলেন তা অনেকের কাছেই প্রশ্নসাপেক্ষ।

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

অশোকের 'ধম্ম' ও ধর্মপ্রচার

অশোকের শিলালিপিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে 'ধম্ম' (ধর্ম) অর্থ হলো 'কল্যাণমূলক কাজ', 'দুশ্চরিত্রতা হতে মুক্তি', 'দয়া', 'দান', 'সত্যবাদিতা', 'পবিত্রতা' ও 'মৃদুতা'। 'ধম্ম' আচরণ করতে হলে এই গুণগুলির অনুশীলন করতে হবে। 'ধম্ম' ছিল অশোকের নিজস্ব আবিষ্কার। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবধারার সমন্বয়ে তিনি ধম্মের নৈতিক নিয়মগুলি রচনা করেছিলেন। কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের কথা না বলে অশোক নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের উপরই জোর দেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, অশোক ধর্মের নামে যা প্রচার করেছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অনুশাসন। আবার রোমিলা থাপার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অশোকের 'ধম্ম' নীতির মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা জাগ্রত করে তোলা। অশোকের ব্যক্তিগত ধর্মমত ছিল বৌদ্ধধর্ম এতে কোন সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু তিনি তাঁর 'ধম্ম' প্রচারের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটান এবং ভারতবাসীকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা নি:সন্দেহে এক আলোকিত অধ্যায়। ব্যক্তি জীবনের পরিশুদ্ধি এবং সমাজ জীবনে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার লক্ষ্যে অশোক কতগুলি আচরণবিধি নির্দেশ করেন। অশোকের বিভিন্ন লিপিতে এইসব আচরণবিধির কথা লেখা আছে; এগুলি হচ্ছে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা, শিক্ষক গুরুজন, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অল্প সঞ্চয় ও অল্প ব্যয়, অন্য ধর্মের নিন্দা থেকে বিরত থাকা, মানুষে মানুষে ভালোবাসার সম্পর্ক জোরদার করা, হিংসা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি। অশোকের 'ধম্ম' এতোটাই উদার ছিল যে তিনি সরাসরি বলেন, 'সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন অপেক্ষা মহৎ কিছু নেই'। তিনি আরো বলেন, 'সকল মানুষ আমার সন্তান'। অশোকের পক্ষে একা ধর্মপ্রচার করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে রাজকর্মচারি নিয়োগ করেন। এছাড়া প্রতি ৫ বছর পরপর তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত বড় বড় কর্মচারিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মস্তম্ভ স্থাপন এবং ধর্মশ্রবণ প্রথার প্রচলন করেন। দানমূলক কাজকে তিনি ধর্মপালন বলে গণ্য করতেন। এভাবে শিকার, বিলাসভ্রমণ, জলসা ইত্যাদি ত্যাগ করে সম্রাট অশোক সন্ন্যাসী রূপে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রশাসনের মূলমন্ত্র ছিল এরকম "হৃদয়হীন শাসন নয়, সেবা - আক্রমণে নয়, ভালোবাসায় অন্যের হৃদয় জয়"।

অশোকের শিলালিপিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে 'ধম্ম' (ধর্ম) অর্থ হলো 'কল্যাণমূলক কাজ', 'দুশ্চরিত্রতা হতে মুক্তি', 'দয়া', 'দান', 'সত্যবাদিতা', 'পবিত্রতা' ও 'মৃদুতা'।

অশোকের 'ধম্ম' নীতির মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা জাগ্রত করে তোলা।

অশোকের বিভিন্ন লিপিতে এইসব আচরণবিধির কথা লেখা আছে; এগুলি হচ্ছে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা, শিক্ষক গুরুজন, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, অল্প সঞ্চয় ও অল্প ব্যয়, অন্য ধর্মের নিন্দা থেকে বিরত থাকা, মানুষে মানুষে ভালোবাসার সম্পর্ক জোরদার করা, হিংসা ও পাপ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি।

তাঁর সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রশাসনের মূলমন্ত্র ছিল এরকম "হৃদয়হীন শাসন নয়, সেবা - আক্রমণে নয়, ভালোবাসায় অন্যের হৃদয় জয়"।

অশোকের সাম্রাজ্য সীমা

অস্ত্রের বদলে সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে গৌতমবুদ্ধের অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করে সম্রাট অশোক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জাতির হৃদয় জয় করেন বলে অনতিবিলম্বে তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কাবুল, হেরাট, কান্দাহার এবং কাশ্মীর ও নেপালের কিছু অংশ সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে দূত প্রেরণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান এবং লিপিগুলিতে খোদিত তথ্য অনুযায়ী অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা লাভ করা যায়।

কৃতিত্ব

ঐতিহাসিক এইচ, জি, ওয়েলস্ বলেছেন, 'ইতিহাসের পাতায় হাজার হাজার নৃপতিগণের মধ্যে অশোকই একমাত্র উজ্জ্বল তারকা'। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে, 'অশোকের মধ্যে ছিল

'অশোকের মধ্যে ছিল চন্দ্রগুপ্তের উদ্যম; সমুদ্রগুপ্তের বিবিধ প্রতিভা এবং আকবরের ঔদার্য'।

চন্দ্রগুপ্তের উদ্যম; সমুদ্রগুপ্তের বিবিধ প্রতিভা এবং আকবরের ঔদার্য'। এমনিভাবে বিশ্বের অনেক ঐতিহাসিকই নি:সংকোচে অশোককে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে বহু গুণের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তিনি অর্জন করেছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন। অশোক বিশ্বনন্দিত সম্রাট; কারণ শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সর্বকালীন আদর্শ দৃষ্টান্ত জগতের সামনে তিনিই স্থাপন করে গেছেন। রাজকর্তব্য সম্পর্কে অশোকের ছিল অতি উচ্চ ধারণা। তাঁর শক্তি, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গঠনমূলক কাজের উপযোগী ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কলিঙ্গ যুদ্ধের সাফল্য সমরকুশলী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর যোগ্যতারই প্রমাণ দেয়। ধর্মপ্রচার ও জনহিতকর কাজ দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও সাধারণ প্রজার মধ্যে ঘনিষ্ট যোগ স্থাপন করে তিনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার যুদ্ধ নীতির প্রয়োজন ছিল না বলে যুদ্ধ ত্যাগ এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধি করতে উপযুক্ত সময়ে অহিংসানীতির প্রবর্তন করায় অশোকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ধর্মক্ষেত্রে মানবিকতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে অশোক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি মানব ধর্মকেই সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও পরধর্মকে নিকৃষ্ট জ্ঞান না করতে' তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতি পরামর্শ দিন। ভারতের বাইরে নিকটবর্তী দেশগুলিতেও তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য যা করেন, ইতিহাসের পাতায় তা একান্তই বিরল। অহিংসানীতি প্রচার করেই তিনি পেশোয়ার থেকে বঙ্গদেশ (বাংলা) এবং কাশ্মীর হতে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অশোকের লিপিমালা হতে জানা যায় যে, তাঁর সময়ে ভারতে এক ভাষা ও এক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলেই পালি 'সর্বভারতীয় ভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও ব্যাপক প্রচলন মহামতি অশোকের সময় শুরু হয়। তাঁর শিলালিপি ও অনুশাসনগুলি জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

'নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও পরধর্মকে নিকৃষ্ট জ্ঞান না করতে' তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতি পরামর্শ দিন।

অশোকের ধর্মপ্রচারের ফলেই পালি 'সর্বভারতীয় ভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

অশোকের মৃত্যু ও সাম্রাজ্যের পতন

সম্ভবত ৪০/৪২ বছর রাজত্ব করার পর সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অনেকেই এ পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মহামতি অশোকের 'যুদ্ধ ত্যাগ নীতি' বা 'অহিংসা নীতি'র সমালোচনা করেন। তবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে বলে মনে করা হয়। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ, ধর্মবিজয় নীতির দুর্বলতা, অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক স্থবিরতা ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ

মহামতি অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহন নিষ্কন্টক ছিল না। পিতৃপুরুষের পথ অনুসরণ করে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করেন এবং তিনি হয়ে ওঠেন মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। এরপর মৌর্য শাসন ব্যবস্থায় জনকল্যাণকামিতা প্রধান গুরুত্ব পায়। তিনি ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করার লক্ষ্যে 'ধর্মবিজয়' শুরু করেন। অশোক যে 'ধম্ম' প্রচার করেছিলেন তা ছিল প্রাধানত: নৈতিক জীবনযাত্রার আদর্শ সম্বলিত বাণী। তিনি পৃথিবীর প্রজাসাধারণকে নিজের সন্তান হিসেবে গণ্য করতেন। প্রথমদিকে যুদ্ধ নীতি এবং পরে ধর্মনীতি প্রচারের মাধ্যমে অশোক এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন - পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কাবুল, হেরাট, কান্দাহার, কাশ্মীর ও নেপালের কিছু অংশও ছিল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত। বহুবিধ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মহামতি অশোক প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকাশিত হয় এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। অশোকের পিতার নাম–
ক. চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য।
খ. বিম্বিসার।
গ. বিন্দুসার।
ঘ. অজাতশত্রু।

২। অশোকের রাজ্য শাসন নীতির পরিবর্তন ঘটে–
ক. মগধের যুদ্ধের পর।
খ. মহীশূরের যুদ্ধের পর।
গ. সিংহলী যুদ্ধের পর।
ঘ. কলিঙ্গ যুদ্ধের পর।

৩। বৌদ্ধ সংগীতি আহবান করা হয়েছিল–
ক. সারনাথে।
খ. পাটলীপুত্রে।
গ. তক্ষশীলায়।
ঘ. কাশ্মীরে।

৪। অশোকের 'ধম্ম' জোর দিয়েছে–
ক. শিক্ষা ও সমরনীতির উপর।
খ. ধর্ম ও নৈতিক নীতির উপর।
গ. সমাজনীতি ও রাজনীতির উপর।
ঘ. পশু বলি রোধ নীতির উপর।

৫। অশোকের সময় ভাষা 'সর্বভারতীয়' চরিত্র পায়–
ক. সংস্কৃত ভাষা।
খ. মৈথিলি ভাষা।
গ. হিন্দি ভাষা।
ঘ. পালি ভাষা।

৬। পাঁচ বছর পর পর অশোক রাজকর্মচারিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন–
ক. অশ্বমেধযজ্ঞ পরিচালনার জন্য।
খ. খাদ্য বিতরণ করার জন্য।
গ. ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্য।
ঘ. রাজমহিমা প্রচার করার জন্য।

৭। অশোকের সাম্রাজ্যসীমা–
ক. পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত।
খ. পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে মগধ এবং উত্তরে শ্রাবস্তী থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত।
গ. পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তরে ইরাবতী নদ থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত।
ঘ. পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে মথুরা থেকে দক্ষিণে পাণ্ড্য পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মহামতি অশোকের প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন আরোহণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. অশোকের 'ধম্ম নীতি' কী তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অশোকের মৃত্যু ও সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

পাঠ ৪

কুষাণ সাম্রাজ্য ও কনিষ্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মৌর্যোত্তর যুগে রাজনৈতিক অবস্থা ও কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কনিষ্কের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতের ইতিহাসে কুষাণ সাম্রাজ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মৌর্যোত্তর যুগ

মৌর্য যুগের পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আবারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মগধের সিংহাসনে বসেন শুঙ্গ বংশের রাজগণ। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশ স্থাপন করে এক স্বাধীন সাম্রাজ্য। কলিঙ্গে চেত বংশের অধীনে অপর এক স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ব্যাকট্রীয় গ্রিকগণ আক্রমণ করেন। একই সময় শক, পার্থিয়ান এবং কুষাণ প্রমুখ বৈদেশিক শক্তি ভারতে আক্রমণ চালায়। বস্তুতপক্ষে মৌর্যোত্তর যুগে ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় বৈদেশিক আক্রমণ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হতে ভারতের উপর পর্যায়ক্রমে যে বৈদেশিক জাতিগুলি আক্রমণ সংঘটিত করে তাদের মধ্যে কুষাণদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল।

ইতিহাসের উপাদান

প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু চৈনিক রচনা, কয়েকটি ভারতীয় এবং আর্মেনীয় রচনা, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইত্যাদি।

কুষাণ যুগের লিখিত এবং অলিখিত বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে। এগুলো থেকেই কুষাণ যুগের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু চৈনিক রচনা, কয়েকটি ভারতীয় এবং আর্মেনীয় রচনা, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইত্যাদি। পান-কু রচিত হ্যান বংশের ইতিহাস, সুমা-সিয়েন রচিত 'শীহ্‌কী' গ্রন্থ, মা-তোয়ান-লিন রচিত বিশ্বকোষ, কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', বেশ কয়েকটি শিলালিপি, কিছু মুদ্রা এবং কুষাণ যুগের স্তূপ, বিহার, প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে সমকালীন ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এগুলোর ভিত্তিতেই আমরা কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং কনিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

কুষাণদের আদি পরিচয়

কুষাণরা ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি'দের আদি বাসস্থান ছিল চিনের উত্তর-পশ্চিম অংশে, কান-সু প্রদেশে। তখন তারা ছিল যাযাবর।

কুষাণ জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে তারা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি ভাগ্য-সন্ধানী উপজাতি; দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা ভারতে রাজ্য স্থাপন করে ভারতের ইতিহাসের স্রোতধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। কুষাণরা ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি'দের আদি বাসস্থান ছিল চিনের উত্তর-পশ্চিম অংশে, কান-সু প্রদেশে। তখন তারা ছিল যাযাবর। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে অপর একটি যাযাবর জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ইউ-চি গণ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এদেরই একটি শাখা 'কুষাণ' নামে পরিচিত হয় এবং ক্রমেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে।

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

কুষাণদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম নায়ক হলেন কুজলা কদফিসিস। তিনিই প্রথম কুষাণদের ছড়ানো-ছিটানো পাঁচ-পাঁচটি শাখাকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। এরপর তিনি কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থান অধিকার করেন এবং ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা চালান। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফিসিস ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ক্রমবর্ধমান কুষাণ জাতির বাসস্থান সংকুলান এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ দখল করে কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করেন। দ্বিতীয় কদফিসিসের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তিনি কান্দাহার ও 'সেন-টু' অধিকার করেন। 'সেন-টু' বলতে নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল বোঝায়, অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলোকে জয় করে তিনি পহ্লব শাসনের অবসান ঘটান। সম্ভবত রোম সম্রাট ট্রাজানের রাজসভায় তিনি

দূত পাঠিয়েছিলেন। গ্রিক মুদ্রার অনুকরণে তিনি স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেন। তাঁর সময় চিন, ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসার প্রসার হয়েছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, 'কুষাণ সাম্রাজ্য একটি বিরাট স্তম্ভের মতো একদিকে গ্রিক-রোমান জগত, অপরদিকে চৈনিক জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিল; ভারত-রোম, ভারত-চিনের মধ্যে কুষাণ সাম্রাজ্য ছিল এক সিংহদ্বার'। দ্বিতীয় কদফিসিসের সময় বারাণসী পর্যন্ত কুষাণ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। তাঁর পর কুষাণ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ক সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

কনিষ্ক

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কনিষ্ক একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি 'কুষাণ শ্রেষ্ঠ' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত। কিন্তু কনিষ্ক কদফিসিস বংশের লোক ছিলেন কিনা এ প্রশ্নে ঐতিহাসিক মহলে দ্বিমত রয়েছে। কনিষ্কের সিংহাসনে আরোহনের সময় এবং রাজত্বকাল সম্মন্ধেও ঐতিহাসিকগণ একমত হতে পারেননি। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া হয় ৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ অভিষেকের বছর থেকে একটি নতুন অব্দের প্রচলন হয়। এই অব্দই ইতিহাসে 'শকাব্দ' নামে পরিচিত। কনিষ্ক একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শাসক এবং তাঁর রাজত্বকাল কর্মবহুল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কনিষ্ক একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি 'কুষাণ শ্রেষ্ঠ' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত।

মুদ্রা

সাম্রাজ্য বিস্তার

কনিষ্ক ছিলেন একজন সার্থক যোদ্ধা। সামরিক যোগ্যতাবলে তিনি বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর ভারতীয় সাম্রাজ্য গান্ধার ও কাশ্মীর হতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যে কাশ্মীর জয় করেন তা রাজতরঙ্গিনী সূত্রে জানা যায়। হিউয়েন সাং সূত্রে জানা যায় গান্ধার ছিল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত। অযোধ্যা ও পাটলিপুত্রের রাজগণের সাথে তাঁর সংঘর্ষের কাহিনী তিব্বতীয় ও চৈনিক সাহিত্যে লেখা আছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, খোটান, কাশগড় ও ইয়ারখন্দ কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে পশ্চিমে খোরাসান হতে পূর্বে বিহার পর্যন্ত এবং উত্তরে খোটান হতে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পুরুষপুর বা বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার ছিল কনিষ্কের রাজধানী। এটি ছাড়া অন্য দুটো নগরের মধ্যে তক্ষশীলা ও মথুরা ছিল বিখ্যাত।

পুরুষপুর বা বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার ছিল কনিষ্কের রাজধানী।

ধর্মীয় অবস্থা

কেবলমাত্র বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবেই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে কনিষ্ক অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পেশোয়ারে তিনি একটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এই মঠ হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধদের অন্তর্বিরোধ দূর করার জন্য তিনি কাশ্মীরে অথবা গান্ধারে বৌদ্ধসভা বা সঙ্গীতি আহবান করেন। এই সম্মেলন চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে পরিচিত। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই খাতে প্রবাহিত হয়। তবে কনিষ্কের বৌদ্ধমত ভারতীয় উদারতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিল। তিনি ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু আদর্শের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাঁর মুদ্রায় গ্রিক, হিন্দু, ইরানি দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে।

কেবলমাত্র বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবেই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে কনিষ্ক অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সাহিত্য ও শিল্পকলা

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের নায়ক হয়েও কনিষ্ক সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের উন্নতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ কনিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করতেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও প্রচার এ সময় থেকে বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভবত এসময় হতেই খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন উঠে যেতে

বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ কনিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করতেন।

এখানকার 'বিশ্ববিদ্যালয়' - এ বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।

থাকে। কনিষ্কের সময়ে গ্রিক, রোমান ও বৌদ্ধ শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে 'গান্ধার শিল্প' নামে খ্যাত ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়। অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। তক্ষশীলা নগরও ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। এখানকার 'বিশ্ববিদ্যালয়' - এ বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। সব কিছু মিলিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক কনিষ্ক যে যাযাবর ইউ-চি জাতির একজন লোক সে কথা ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

কুষাণ শাসনের তাৎপর্য

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কুষাণ রাজগণ দেশী ও বিদেশী ধারার সমন্বয় সাধন করেন।

বহিরাগত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কুষাণদের শাসন বিশেষ তাৎপর্যবহ। কুষাণদের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের সূত্র ধরেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি কুষাণদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। চিন হতে ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যে যে মূল্যবান রেশমবস্ত্র পাঠানো হতো তার বাণিজ্যপথ ছিল মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্থান। এই 'সিল্ক পথ' কুষাণদের অধীনে থাকায় বণিকদের কাছ থেকে প্রচুর শুল্ক পাওয়া যেতো। সবচেয়ে বড় কথা, উচ্চমানের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থেকেই সন্দেহাতীতভাবে কুষাণ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কুষাণ রাজগণ দেশী ও বিদেশী ধারার সমন্বয় সাধন করেন। এভাবে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতে এক মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রধান অবদান এই যে, তাঁরা একদিকে ভারত-সংস্কৃতি আস্থা করে ভারতের বাইরে তা প্রচারে ব্রতী হয়েছেন; অন্যদিকে মধ্য এশীয় সংস্কৃতির ছোঁয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তুলেছেন।

কনিষ্ক তথা কুষাণদের রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়।

কনিষ্ক তথা কুষাণদের রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। কুষাণশ্রেষ্ঠ কনিষ্ক কেবলমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী বীর ছিলেন না। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্য ও শিল্পের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। জ্ঞানী ও গুণীর যথেষ্ট সমাদর ছিল তাঁর রাজসভায়। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, বাণিজ্যিক উন্নতি, বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, সংমিশ্রিত শাসন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয়করণ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুষাণদের বিশেষত: কনিষ্কের স্থান নির্ধারণ করেছে।

সার-সংক্ষেপ

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের ইতিহাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাস। এই রাজনৈতিক অনৈক্য দূর করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই কুষাণ রাজবংশের খ্যাতি। মধ্য এশিয়ার এক উপজাতি কুষাণগণ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং কনিষ্কের সময়ে উত্তর ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য তারা স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

কণিষ্কই কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত এবং উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর, বর্তমান পেশোয়ার। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কনিষ্কের খ্যাতি সমধিক। তাঁর রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ব্যাপক বাণিজ্যের মাধ্যমে কুষাণ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল সবল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৪

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মৌর্যোত্তর যুগে যে সব বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করেন–
   ক. কুষাণ, শক, সাতবাহন ও শুঙ্গ।
   খ. গ্রিক, শক, কুষাণ ও পার্থিয়ান।
   গ. কুষাণ, কান্ব, যবন ও গ্রিক।
   ঘ. সাতবাহন, পার্থিয়ান, শুঙ্গ ও শক।

২। কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম নেতার নাম কি?
   ক. কনিষ্ক।

খ. কদফিসিস, দ্বিতীয়।
গ. কুজলা কদফিসিস।
ঘ. হুবিষ্ক।

৩। কনিষ্কের সিংহাসনে বসার তারিখ–
ক. ১২৫-১২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।
খ. ১৩০-১৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।
গ. ১০২ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

৪। কনিষ্কের রাজধানী শহর ছিল–
ক. তক্ষশীলা।
খ. মথুরা।
গ. পুরুষপুর।
ঘ. খোটান।

৫। কনিষ্কের সাম্রাজ্যসীমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
ক. ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে একাত্মা স্থাপন।
খ. ইরান ও আফগানিস্থানের সম্পর্ক জোরদারকরণ।
গ. মধ্যএশিয়া ও ভারতের মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপন।
ঘ. গ্রিক ও ভারতের সম্পর্কের উন্নতি ঘটান।

৬। কুষাণ রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন–
ক. বসুমিত্র, কালিদাস, হরিষেণ ও পতঞ্জলী।
খ. অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক ও বসুমিত্র।
গ. নাগার্জুন, কালিদাস, কৌটিল্য ও বাণভট্ট।
ঘ. কলহণ, অশ্বঘোষ, চরক ও হরিষেণ।

৭। কনিষ্কের সময়ে উৎকর্ষ সাধিত হয়ে ছিল–
ক. মথুরা শিল্পের।
খ. নৃত্য শিল্পের।
গ. টেরাকোটা শিল্পের।
ঘ. গান্ধার শিল্পের।

৮। 'গ্রিক-রোমান জগত ও চিনা জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিল কুষাণ সাম্রাজ্য; ভারত-চিনের মধ্যে কুষাণ সাম্রাজ্য ছিল এক সিংহদ্বার - উক্তিটি করেছিলেন–
ক. হিউয়েন সাং।
খ. ডঃ ব্যাশাম।
গ. জওহর লাল নেহেরু।
ঘ. ডঃ বি, এন, মুখার্জী।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মৌর্যোত্তর যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ও কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন।
২. কনিষ্কের পরিচয় তুলে ধরুন।
৩. কনিষ্কের সময়ের ধর্মীয় অবস্থার বিবরন দিন।
৪. সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কনিষ্কের মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৫

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 'লিচ্ছরিয়া' বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।

কুষাণোত্তর যুগে ভারত

আগের পাঠ হতে আপনারা কুষাণ সাম্রাজ্য সম্পর্কে জেনেছেন। কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের পর বেশ কিছুদিন কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক ভারত শাসিত হয়নি। বশিষ্ক, হবিষ্ক, প্রথম বাসুদেব প্রমুখ কুষাণ রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুদিন রাজত্ব করেন। অবশ্য ইতোমধ্যেই কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের উপর নতুন কতোগুলো রাজ্যের উদ্ভব হয়। তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত কোন কোন কুষাণ রাজা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছিলেন বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বহুখন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলে স্থাপিত হয় বিদেশী রাজগণের আধিপত্য। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় নাগবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশেও বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপজাতীয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। এসময় দক্ষিণ ভারতও বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রায় ১৫০ বছর ধরে বিরাজমান এই বিশৃংখল পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে ভারত-বর্ষে আবারো রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব ভারতের একটি রাজবংশ। গুপ্ত নামধারী এই রাজবংশের হাতেই প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় রচিত হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশ ছিল বহির্ভারতীয় বা মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গমাত্র। রাজ্যজয় ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি থেকেই এসেছিল কুষাণ সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য চরিত্রগতভাবে ছিল একান্তই ভারতীয়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্ববহ। ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তরা ভারত শাসন করেন।

> গুপ্ত সাম্রাজ্য চরিত্রগতভাবে ছিল একান্তই ভারতীয়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা খুবই গুরুত্ববহ। ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তরা ভারত শাসন করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে যে বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বৈদেশিক শক্তিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটছিল তার বিপরীতে কেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব হলো তা ঐতিহাসিকদের সামনে এক গভীর জিজ্ঞাসা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল বৈদেশিক আক্রমণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান। অপর কয়েকজন ঐতিহাসিক গুপ্তদের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় শক্তিশূন্যতা এবং গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরা অঞ্চলের অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীগুপ্ত। তিনি শুধুমাত্র 'মহারাজ' উপাধী ব্যবহার করতেন এবং সম্ভবত মগধের অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাঁরই পুত্র ঘটোৎকচ; তিনিও 'মহারাজ' উপাধী ব্যবহার করতেন। তাঁরা স্বাধীন নৃপতি নাকি সামন্তরাজ ছিলেন, তা বলা কঠিন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং - এর রচনাকে ব্যাখ্যা করে অনেকে মনে করেন যে, শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্তের আদি বাসস্থান ছিল বাংলার বরেন্দ্রী এলাকায়। কেউ কেউ মনে করেন, সারনাথ অঞ্চল ছিল গুপ্তদের আদি বাসস্থান।

> গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল বৈদেশিক আক্রমণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

প্রাচীন ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সময়কাল ধরা হয় ৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হলেন ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র। তাঁর সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধীধারী প্রথম গুপ্ত শাসক। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের কাল হতে 'গুপ্ত অব্দ'প্রচলিত হয়। রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি গুপ্ত বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। গুপ্তদের

মুদ্রা

বিভিন্ন শিলালিপি, সাহিত্যিক উপাদান, চৈনিক বিবরণ এবং মুদ্রা ও স্থাপত্য থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

রাজ্যবিস্তার

আগেই বলা হয়েছে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধী গ্রহণ করেছিলেন। কারো কারো মতে, শক মুরন্ডদের উৎখাত করে মগধ জয় করার পর তিনি বিজয়সূচক এই উপাধী গ্রহণ করেন। 'কৌমুদী মহোৎসব' নাটকের বিবরণ অনুসারে বলা হয়ে থাকে যে, সুন্দর বর্মন নামে একজন রাজাকে উৎখাতের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্ত মগধ জয় করেন। তিনি কোশল ও কোশাম্বী অধিকার করে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। কোন কোন সূত্র থেকে অনুমিত হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তর বাংলা জয় করেছিলেন। অবশ্য এ তথ্য সন্দেহাতীত নয়। তবে তিনি যে উত্তর প্রদেশ ও মগধ জয় করেছিলেন তা নিশ্চিত। পাটলীপুত্র ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী।

পাটলীপুত্র ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী।

'লিচ্ছবিয়াঃ' বিবাহের গুরুত্ব

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন 'লিচ্ছাবিয়াঃ' রাজবংশে। এরা ছিলেন প্রাচীন ও সুপরিচিত জাতিগোষ্ঠী। রাজবংশে বিবাহের ফলে গুপ্ত বংশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা, গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা কখনোই উল্লেখ করেননি - সম্ভবত তাঁরা ছিলেন বৈশ্য। কিন্তু 'লিচ্ছবিয়াঃ' রাজবংশে বিবাহ গুপ্তদেরকে আলোকিত অবস্থানে পৌঁছাতে যথেষ্টভাবে সহায়তা করেছিল। এই বিবাহের ফলে গুপ্তরা দক্ষিণ বিহারে মহামূল্য স্থানগুলোর উপর তাঁদের অধিকার লাভ করেছিলেন। এভাবে তাঁরা বিপুল সম্পদেরও অধিকারী হন। ক্রমেই গুপ্তরা উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। সুতরাং 'লিচ্ছবিয়াঃ' রাজকন্যাকে বিবাহের ঘটনা গুপ্তদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। এই বিবাহকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ এক ধরনের স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। এই মুদ্রার এক পিঠে আছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর প্রতিকৃতি এবং অপর পিঠে সিংহের উপর উপবিষ্ট দেবতার প্রতিকৃতি। এখানে খোদিত আছে 'লিচ্ছবিয়াঃ' শব্দটি। গুপ্ত বংশ এবং 'লিচ্ছবিয়াঃ' রাজবংশের মধ্যে বিবাহজাত সন্তান হলেন সমুদ্রগুপ্ত। তিনিও নিজ মুদ্রায় নিজেকে 'লিচ্ছবিয়াঃ দৌহিত্র' বলে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং 'লিচ্ছবিয়াঃ' বংশে বিবাহ যে গুপ্তদের জন্য সৌভাগ্যসূচক ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

'লিচ্ছবিয়াঃ' রাজবংশে বিবাহ গুপ্তদেরকে আলোকিত অবস্থানে পৌঁছাতে যথেষ্টভাবে সহায়তা করেছিল।

যাই হোক না কেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ সামরিক যোগ্যতা, অসাধারণ কূটনীতি, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে যান। উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার এবং পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত এলাকায় তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন।

সার-সংক্ষেপ

কুষাণোত্তর যুগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব দেখা যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় শক্তিশূন্যতা এবং গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরা ভূমির উপর ভিত্তি করেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। শ্রীগুপ্তই গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভবের অগ্রদূত। তবে তাঁর পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে গুপ্তদের বিকাশ লক্ষ করা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গুপ্ত বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাটলীপুত্রকে রাজধানী করে মগধ, উত্তর প্রদেশ ও নিকটবর্তী অঞ্চলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 'লিচ্ছবিয়াঃ' রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এই বিবাহ গুপ্ত বংশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আদি পুরুষ ছিলেন–
ক. ঘটোৎকচ গুপ্ত।
খ. স্কন্ধ গুপ্ত।
গ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
ঘ. শ্রীগুপ্ত।

২। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গ্রহণ করেন–
ক. 'মহারাজ' উপাধি।
খ. 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি।
গ. 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি।
ঘ. 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধি।

৩। 'গুপ্তাব্দ' প্রচলিত হওয়ার আনুমানিক তারিখ–
ক. ২২০ খ্রিস্টাব্দ।
খ. ৩২০ খ্রিস্টাব্দ।
গ. ৪২০ খ্রিস্টাব্দ।
ঘ. ২৩০ খ্রিস্টাব্দ।

৪। গুপ্ত বংশের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে–
ক. মগধ দখলের ঘটনা।
খ. কোশল ও কোশাম্বী দখলের ঘটনা।
গ. 'লিচ্ছবিয়া:' রাজকন্যাকে বিবাহের ঘটনা।
ঘ. সঠিক উত্তরাধিকার মনোনয়নের ঘটনা।

৫। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী শহর ছিল–
ক. বিহার।
খ. মগধ।
গ. পাটলীপুত্র।
ঘ. কোশল।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
২. গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস আলোচনা করুন।
৩. 'লিচ্ছবিয়া:' বিবাহের উল্লেখপূর্বক প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্তদের যে বিস্তৃতি ঘটেছিল তা বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬

সমুদ্রগুপ্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান

আগের পাঠ হতে আপনারা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়ন সম্পর্কে জেনেছেন। সমুদ্রগুপ্ত সম্ভাবত ৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। সমুদ্রগুপ্তের সামগ্রিক ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে। এগুলির মধ্যে রাজকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', এরন, নালন্দা ও গয়া লিপি, পাঁচ (৫) ধরণের মুদ্রা, চৈনিক বিবরণ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, 'কৌমুদী মহোৎসব' নামক একটি নাটিকা, কালিদাসের 'রঘুবংশম্' ইত্যাদি বিখ্যাত। এই উপাদানগুলির মধ্যে 'এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি' বা প্রশস্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ঐতিহাসিক মহলে সমাদৃত। এলাহাবাদের দুর্গে রক্ষিত এই প্রশস্তিখানি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরই সম্ভবত উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ দাবী করেন, সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পরই এটি রচিত। কবি হরিষেণের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। প্রশস্তিটির কতকাংশ কাব্যে রচিত। এতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়, রাজ্যশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে হরিষেণ যেহেতু সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি তাই তাঁর রচনায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। অলংকৃত সাহিত্যে এটি রচিত। ডঃ কোশাম্বীর মতে, এর ছত্রে ছত্রে সমুদ্রগুপ্তের 'সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ' ছড়িয়ে আছে।

সমুদ্রগুপ্ত সম্ভাবত ৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজ্যবিজেতা রূপে যে সকল সম্রাট খ্যাতি লাভ করেছেন, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার স্থানীয় একটি রাজ্যকে তিনি সর্বভারতীয় এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রাচীন ভারতের তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ হিসেবে সমুদ্রগুপ্ত বিখ্যাত। বস্তুত: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের পর এতো বড় বিজয়ী বীর ভারতের ইতিহাসে আর আসেননি। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয়জন (৯) রাজাকে পরাজিত করেন। এঁরা হলেন অচ্যুত, নাগসেন, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মন, গণপতিনাগ, নন্দী ও বলবর্মন। প্রশস্তি অনুযায়ী সমুদ্রগুপ্ত এরপর পুষ্পনগরে আনন্দ উৎসব করেন। প্রাচীনকালে কনৌজ বা কান্যকুব্জের নাম ছিল পুষ্পপুর। তাই অনেকেই মনে করেন সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবত: কনৌজ হতেই উল্লিখিত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। আর্যাবর্তের প্রায় সকল রাজ্যই গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করে সমুদ্রগুপ্ত 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধী গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতে বিজয়াভিযান সমাপ্ত হলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। খুব সম্ভবত: তাঁর অভিযান মধ্য প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে, উড়িষ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের যে বারোজন (১২) শাসককে তিনি পরাজিত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কোশল রাজ্যের রাজা মহেন্দ্র, মহাকান্তার অঞ্চলের ব্যাঘ্ররাজ, কোট্টরের রাজা স্বামীদত্ত, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, বেঙ্গী রাজ্যের হস্তিবর্মণ, কুস্থলাপুরের রাজা ধনঞ্জয় এবং আরো অনেকে। এ সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকার শাসকগণ এবং পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারত, মালব ও মধ্য প্রদেশের উপজাতিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার স্থানীয় একটি রাজ্যকে তিনি সর্বভারতীয় এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। প্রাচীন ভারতের তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ হিসেবে সমুদ্রগুপ্ত বিখ্যাত।

সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেসব রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে সেগুলির মধ্যে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট, আসামের ডবাক ও কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর (সনাক্তকরণ বিতর্কিত) ইত্যাদি। এলাহাবাদ লিপিতে বলা হয়েছে যে, পরাজিত রাজন্যবর্গ 'কর প্রদান করে, আদেশ পালন করে ও বশ্যতা জ্ঞাপন করে সমুদ্রগুপ্তের সম্রাটোচিত নির্দেশ পালন করেছিল'। এভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা

পরাজিত রাজন্যবর্গ 'কর প্রদান করে, আদেশ পালন করে ও বশ্যতা জ্ঞাপন করে সমুদ্রগুপ্তের সম্রাটোচিত নির্দেশ পালন করেছিল'।

বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্ভবত: সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন তা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণে ভিলশা-জব্বলপুর এলাকা অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা, পশ্চিমে পাঞ্জাব (পূর্ব পাঞ্জাব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ অর্থাৎ সমতট ব্যতীত সমগ্র বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছোটনাগপুর পর্বতমালা থেকে মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অর্য্যণাঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে। এছাড়া দাক্ষিণাত্যের রাজগণ ও সীমান্তের অন্যান্য রাজ্যগুলো তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ছিল প্রভুত্ব ও স্বায়ত্বশাসনের এক অপূর্ব সমন্বয়। দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে সমুদ্রগুপ্ত 'অশ্বমেধযজ্ঞ' অনুষ্ঠান করেন এবং এই যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ছিল প্রভুত্ব ও স্বায়ত্বশাসনের এক অপূর্ব সমন্বয়।

সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যতোদূর জানা যায়, মালব ও সৌরাষ্ট্র রাজগণ তাঁকে নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্মন তাঁর সভায় একজন দূত প্রেরণ করেন এবং সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে তিনি বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। সম্ভবত: মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের উপনিবেশগুলোর উপরও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর রাজ্যসীমার বাইরেও অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছিল।

সম্ভবত মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের উপনিবেশগুলোর উপরও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ থেকে এটা নি:সন্দেহ যে, তিনি একজন সমরবিশারদ ও প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন। 'রাজ্য অধিগ্রহণ করাই হলো রাজার কর্তব্য কাজ' - এই নীতি নিয়ে তিনি কখনোই ইতস্তত: করেননি। ড: স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে 'সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত শাসক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলে। ড: হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে, 'আ-সমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমিকে এক শাসনে আবদ্ধ করাই সমুদ্রগুপ্তের লক্ষ্য ছিল'। ড: রোমিলা থাপার সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে বলেন, 'সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে দেন'। কোন কোন জাতীয়বাদী ঐতিহাসিক বলেন, সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন 'ধর্মবিজয়ী'। তাঁকে 'সাম্রাজ্যবাদী' বা 'আগ্রাসী' বলা চলে না। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনই সমুদ্রগুপ্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে তাঁদের বিশ্বাস। ড: গয়াল সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ করেছেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ থেকে এটা নি:সন্দেহ যে, তিনি একজন সমরবিশারদ ও প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন।

'আ-সমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমিকে এক শাসনে আবদ্ধ করাই সমুদ্রগুপ্তের লক্ষ্য ছিল'।

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

রাজকবি হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' হতে সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্মন্ধে বহু কিছু জানতে পারা যায়। তিনি কেবলমাত্র একজন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসকও । দক্ষিণ ভারতের রাজাদের সম্পর্কে তিনি যে মিত্রতামূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্ত একাধারে সামরিক বীর এবং সুদক্ষ শাসকের পাশাপাশি বহু কবিতা লিখে 'কবিরাজ' উপাধী পেয়েছিলেন বলে হরিষেণ সূত্রে জানা গেছে। সঙ্গীতও ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। কোন কোন মুদ্রায় উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত প্রতিমূর্তি হতে প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন বিদ্যাচর্চারও পৃষ্ঠপোষক। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পন্ডিত বসুবন্ধু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন এবং অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর স্বর্ণমুদ্রাগুলো শিল্পকীর্তি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র একজন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসকও ।

হরিষেণের প্রশস্তির আলোকে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বিচারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সভাকবি হিসেবে অনেক তথ্যই হরিষেণ বাড়িয়ে বলেছেন। সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারত জয় করেননি একথা যেমন সত্য, তাঁর সাম্রাজ্য যে ভারতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল - একথাও মিথ্যে নয়। তবে সমুদ্রগুপ্তের অন্যান্য গুণাবলীর বিষয়ে প্রশস্তিতে অতিশয়োক্তি নেই বলেই মনে হয়। প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে 'অচিন্ত্য পুরুষ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একই সাথে বলা হয়েছে তিনি সাধু ব্যক্তিদের কাছে ছিলেন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং অসাধু ব্যক্তিদের কাছে তিনি ছিলেন প্রলয়স্বরূপ।

সমুদ্রগুপ্ত সাধু ব্যক্তিদের কাছে ছিলেন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং অসাধু ব্যক্তিদের কাছে তিনি ছিলেন প্রলয়স্বরূপ।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারায় সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছেন প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম উপজীব্য। হরিষেণের রাজপ্রশস্তি থেকে এই দিগ্বিজয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তবে এই বিবরণে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আর্যাবর্তের বিশাল এক অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসন এবং এর সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরোক্ষ শাসনাধীন ছিল। তিনি বিজয়সূচক 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' উপাধী ধারণ করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকের বিবেচনায় তিনি 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। সমুদ্রগুপ্ত একাধারে সুদক্ষ শাসক এবং কবিতা ও সঙ্গীত রসিক ব্যক্তি ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সমুদ্রগুপ্তের পিতামহের নাম–
ক. ঘটোৎকচ গুপ্ত।
খ. শ্রী গুপ্ত।
গ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
ঘ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

২। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' রচনা করেন–
ক. কালিদাস।
খ. মেগাস্থিনিস।
গ. হরিষেণ।
ঘ. বিশাখদত্ত।

৩। 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' ভাষার–
ক. মৈথিলি।
খ. অলংকৃত সংস্কৃত।
গ. পালি।
ঘ. তামিল।

৪। কনৌজের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয় নাগরটিকে–
ক. মহাকান্তার।
খ. কাঞ্চী।
গ. কোশল।
ঘ. পুষ্পপুর।

৫। সমুদ্রগুপ্ত হলেন 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' -উক্তিটি করেছেন–
ক. ডঃ রোমিলা থাপার।
খ. ডঃ ব্যাশাম।
গ. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
ঘ. ডঃ স্মিথ।

৬। হরিষেণের মতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরাজিত রাজার সংখ্যা–
ক. উত্তর ভারতের ১২ জন এবং দক্ষিণ ভারতের ৯ জন।
খ. উত্তর ভারতের ১০ জন এবং দক্ষিণ ভারতের ১২ জন।
গ. উত্তর ভারতের ৯ জন এবং দক্ষিণ ভারতের ১২ জন।
ঘ. উত্তর ভারতের ১২ জন এবং দক্ষিণ ভারতের ১০ জন।

৭। সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল–
ক. কাঞ্চী, কোশল, মহাকান্তার, বেঙ্গী ও কুস্থলাপুর।
খ. শ্রাবন্তী, অহিচ্ছত্র, মথুরা, বাকাটক ও কৌরল।
গ. সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্তৃপুর।
ঘ. কোমল, শ্রাবন্তী, ডবাক, বেঙ্গী ও সমতট।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান কী কী? উল্লেখ করুন।

২. "আ-সমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমিকে এক শাসনে আবদ্ধ করাই সমুদ্রগুপ্তের লক্ষ্য ছিল" ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৭

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতির পরিচয় দিতে পারবেন।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিক্রমাদিত্য বিষয়ক কিংবদন্তী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ ইতিহাসের উপাদান

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনয়ন অনুসারে তাঁরই পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিলেন, যথা- বিক্রমাদিত্য, নরেন্দ্রচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, দেবরাজ, দেবশ্রী, দেবগুপ্ত ইত্যাদি। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যবর্তী সময়ে রামগুপ্ত নামে আর একজন গুপ্ত সম্রাট রাজত্ব করেন। কিন্তু এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কেবলমাত্র গুপ্তোত্তর সাহিত্যেই রামগুপ্তের নাম পাওয়া যায়, কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে তাঁর নাম সমর্থিত নয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রচিত বীরসেন - এর উদয়গিরি গুহালিপি, এরন শিলালিপি সহ অন্যান্য লিপিমালা, সমসাময়িক মুদ্রা ও সাহিত্য এবং চৈনিক বিবরণ হতে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। মথুরা ও সাঁচী লিপির সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিংহাসনে বসেন এবং ৪০ বছর রাজত্ব করে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিংহাসনে বসেন এবং ৪০ বছর রাজত্ব করে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

রাজ্য বিস্তার

উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অনুসরণে তিনি নাগ ও বাকাটক রাজবংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এই সাম্রাজ্যকে আরো সুদৃঢ় করেন। তিনি নিজে নাগ রাজকন্যা কুবের দেবীকে বিবাহ করেন ও তার ফলে ভারতের পূর্ব সীমান্তে গুপ্ত সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। এরপর তিনি নিজ কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনার বিবাহ দিয়ে ঐ রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। নাগ ও বাকাটকদের সাথে এই সম্মন্ধ পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, কারণ তাঁরা যে ভূ-খন্ডে রাজত্ব করতেন তা হতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারী উত্তর ভারতীয় শাসককে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাঁধা প্রদান করতে পারতেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরবর্তীতে শক্ রাজ্যগুলি অধিকার করেন। শকদের ধ্বংস সাধন করে তিনি 'শকারী' উপাধী নেন। পশ্চিম মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে শক শাসনের অবসানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় - এভাবে গুপ্ত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পথও হয় প্রশস্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাটলীপুত্র এবং পরে উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্য তথা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাটলীপুত্র এবং পরে উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্য তথা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন বলে একটি সূত্র থেকে জানা যায়। দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে 'মেহরাওয়ালী'তে প্রাপ্ত একটি লৌহস্তম্ভে 'চন্দ্র' নামধারী জনৈক রাজার সন-তারিখ বিহীন লিপিতে খোদিত আছে- 'রাজা চন্দ্র পূর্ববঙ্গের শত্রুভাবাপন্ন রাজগণকে দমন এবং মধ্য এশিয়ায় বাহলীক (বল্খ) দেশ অধিকার করেন'। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'চন্দ্র' কে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। বিরোধী মতের প্রবর্তকরা বলেন, সম্ভবত: এই 'চন্দ্র' হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। ড: গয়াল অবশ্য বলেন, 'চন্দ্র' যদি নাম না হয়ে রাজার দেহ সুষমা বর্ণনার বিশেষণ হয়ে থাকে তবে 'মেহ্রাওয়ালী স্তম্ভলিপি'র বর্ণনা সমুদ্রগুপ্তের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। যাই হোক না কেন, লিপিতে বর্ণিত ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন তাহলে তিনি সম্ভবত: বঙ্গদেশের সামন্তরাজাদের বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা সমতট দখল করেছিলেন।

লিপিতে বর্ণিত ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হন তাহলে তিনি সম্ভবত: বঙ্গদেশের সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা সমতট দখল করেছিলেন

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কিংবদন্তীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য শকদেরকে পরাজিত করেছিলেন এবং মহাকবি কালিদাস সহ 'নবরত্ন' তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকদেরকে পরাজিত করেন, এটি ঐতিহাসিক সত্য। মহাকবি কালিদাস তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, এটিও সত্য হতে পারে। একারণেই হয়তো পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে যে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে তা থেকে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বা কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'নবরত্ন' - এর সবাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত ছিলেন না। যেমন, 'জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির যে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন না' তা নিশ্চিত। এছাড়া কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্য 'বিক্রমাব্দ' প্রবর্তন করেন। বিক্রমাব্দ খ্রিস্টপূর্ব ৫২ অব্দে শুরু হয়। সুতরাং কোনক্রমেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে এর প্রবর্তক বলা চলে না। তবে সম্ভবত: এই অব্দের সাথে 'বিক্রম' নামের যোগাযোগ পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। যাই হোক না কেন, বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তী জনমানসে পরবর্তী যুগে একাধারে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সংস্কৃতি প্রয়াস ও স্কন্দগুপ্তের হূন বিজয়কে মিশ্রিত করেই গড়ে ওঠে বলে মনে করা হয়।

> কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কিংবদন্তীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। সমুদ্রগুপ্তকে যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারকর্তা বলা যায় তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে এই সাম্রাজ্যের সংগঠক বলা চলে। তিনি ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক। সামরিক প্রতিভার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। বিদ্যোৎসাহী সম্রাট হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন তাঁর সমকালীন। নব-রত্নের বেশ কয়েকজন তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' বা 'শক্তির সূর্য' উপাধী গ্রহণ করেন। এই উপাধীর কারণে অনেকেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে 'কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য' হিসেবে মনে করেন। তাঁর পরবর্তীকালে কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের হাল ধরেন।

> সমুদ্রগুপ্তকে যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারকর্তা বলা যায় তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে এই সাম্রাজ্যের সংগঠক বলা চলে

সার-সংক্ষেপ

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। পশ্চিম ভারত থেকে শকদের বিতাড়ন তাঁর মুখ্য সামরিক কৃতিত্ব। এছাড়াও অন্যান্য দিকে তিনি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেন এবং দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নাগ ও বাকাটক বংশীয় রাজাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মহাকবি কালিদাসসহ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। শৌর্য-বীর্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয় বহন করে তাঁর রাজত্বকাল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সম্ভবত: 'কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'বিক্রমাদিত্য' শব্দের অর্থ–
   ক. সূর্য্যের শক্তি।
   খ. পৃথিবীর শক্তি।
   গ. শক্তির সূর্য।
   ঘ. পৃথিবীর সূর্য।

২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সম্মন্ধ স্থাপন করেন–
   ক. লিচ্ছবিয়া: ও নন্দ রাজবংশের সাথে।
   খ. শক ও নাগ রাজবংশের সাথে।
   গ. বাকাটক ও শক রাজবংশের সাথে।
   ঘ. নাগ ও বাকাটক রাজবংশের সাথে।

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানী হচ্ছে–
ক. উজ্জয়িনী।
খ. তক্ষশীলা।
গ. পাটলীপুত্র।
ঘ. পুষ্পনগর।

৪। 'চন্দ্র' নামধারী রাজা কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকারের সংবাদ জানার উৎস হচ্ছে–
ক. উদয়গিরি গুহালিপি থেকে।
খ. এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে।
গ. মেহরাওয়ালী স্তম্ভলিপি থেকে।
ঘ. চৈনিক বিবরণ থেকে।

৫। শক শাসনের অবসানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়–
ক. ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর পর্যন্ত।
খ. নর্মদা নদীর তীর পর্যন্ত।
গ. বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত।
ঘ.আরব সাগরের তীর পর্যন্ত।

৬। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন কবির নাম–
ক. কবি হরিষেণ।
খ. কবি বীরসেন।
গ. কবি কালিদাস।
ঘ. কবি সন্ধ্যাকর নন্দী।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসের উপাদান কী? উল্লেখ করুন।
২. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮

ফা-হিয়েনের বর্ণনায় সমকালীন ভারত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- চিনা পর্যটক ফা-হিয়েন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- গুপ্ত যুগে ভারতের আর্থ-সামাজিক এং ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশীদের বর্ণনার গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ফা-হিয়েনের পরিচিতি

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে যেসব বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে আসেন তাঁদের মধ্যে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন ফা-হিয়েন

ফা-হিয়েনের প্রকৃত নাম কুঙ্গ, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নামকরণ হয় ফা-হিয়েন – যার অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রচার শুরু হয় কালক্রমে তা প্রসারিত হয় চিন দেশেও। কুষাণ আমলে ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মযাজকেরা চিনে গিয়ে চিনা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থাদি অনুবাদ শুরু করেন। এসময় চিনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময়ই কেউ কেউ ভারতে আসেন বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখবার জন্য এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে যেসব বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে আসেন তাঁদের মধ্যে পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন ফা-হিয়েন। তিনি ছিলেন চিনের চ্যাংগান শহরের অধিবাসী। এটি শানসী প্রদেশের প্রধান শহর। ফা-হিয়েনের প্রকৃত নাম কুঙ্গ, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তাঁর নামকরণ হয় ফা-হিয়েন – যার অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি।

৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফা-হিয়েন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। গোবি, খোটান, পামির মালভূমি এং গান্ধার দেশ অতিক্রম করে তিনি ৪০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি টানা ১০ বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। এর মধ্যে ৬ বছর তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন। ফা-হিয়েন পাটলীপুত্র নগরীতে ৩ বছর এবং বাংলার প্রাচীন সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্তিতে ২ বছর বসবাস করেছিলেন। এই স্থান হতে তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থাদি সহ সিংহল ও নবদ্বীপ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফা-হিয়েন যদিও তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কোন রাজার নাম উল্লেখ করেননি, তবু এটা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ই ভারত আসেন। তাঁর বিবরণ গুপ্ত যুগের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য একটি মূল্যবান উপাদান।

পাটলীপুত্র ও তাম্রলিপ্তি

পাটলীপুত্র এবং তাম্রলিপ্তি নগর সম্পর্কে ফা-হিয়েন বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন

পাটলীপুত্র এবং তাম্রলিপ্তি নগর সম্পর্কে ফা-হিয়েন বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। পাটলীপুত্রে তিনি দুটি বৃহদাকার বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন। বহু শিক্ষার্থী এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়তেন। এই নগরে অশোকের নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদের কারুকাজ ও নির্মাণ নৈপুণ্য ফা-হিয়েনকে মুগ্ধ করেছিল। এখানকার নাগরিকদের সচ্ছল জীবনযাপন ও তাদের দানশীলতার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি রাস্তার পাশে অসংখ্য সরাইখানা দেখতে পান। দরিদ্র ও দু:স্থ রোগীদের জন্য নির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু অনাথ আশ্রমও তিনি দেখেছিলেন। পাটলীপুত্র থেকে চম্পা (বর্তমান বিহারের ভাগলপুর) হয়ে তিনি গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তম্লুকই হচ্ছে এই তাম্রলিপ্তি। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, এটি ছিল রাজধানী শহর। এখানে তিনি ২৪টি বৌদ্ধ বিহার ও অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। তাম্রলিপ্তিতে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন, পুঁথি নকল এবং বৌদ্ধ মূর্তির চিত্র ও নক্শা অংকনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়াও ফা-হিয়েন বৌদ্ধগয়া নগর, তক্ষশীলা, পেশোয়ার, কনৌজ, মথুরা, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর এবং উজ্জয়িনী নগরের কথা লিখেছেন।

শাসন ব্যবস্থা

ফা-হিয়েন সমকালীন ভারতের অর্থাৎ গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন

ফা-হিয়েন সমকালীন ভারতের অর্থাৎ গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, গুপ্ত শাসন-প্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। শাসনবিধি ছিল উদার, দন্ডবিধির কোন কঠোরতা ছিল না। ছিল না দেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে যাতায়াতের উপর কোন বিধিনিষেধ। দায়িত্বশীল রাজকর্মচারিদের দ্বারা দেশ শাসিত হতো। শাসক শ্রেণী কর্তৃক জনগণ নির্যাতিত হতেন না। উৎপন্ন শস্যের এক নির্দিষ্ট

অংশ রাজকর হিসেবে ধরা হতো। অর্থদন্ড ছিল সাধারণ অপরাধের শাস্তি। কেবলমাত্র রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করা হতো। প্রাণদন্ড ছিল খুবই অল্প ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জনগণের জীবনযাত্রা

ফা-হিয়েন লিখেছেন, সমকালীন ভারতের লেখকেরা ছিলেন সুখী ও সন্তুষ্ট। জনগণের নৈতিক মান ছিল উন্নত। তারা মেনে চলতেন অহিংসা নীতি

ফা-হিয়েন লিখেছেন, সমকালীন ভারতের লেখকেরা ছিলেন সুখী ও সন্তুষ্ট। জনগণের নৈতিক মান ছিল উন্নত। তারা মেনে চলতেন অহিংসা নীতি। জনসাধারণ প্রধানত নিরামিষ খাদ্য পছন্দ করতেন। পেঁয়াজ বা রসুন তারা খেতেন না। চন্ডালরা মাংস এবং মদ খেতেন। তবে তারা নগরের বাইরে বাস করতে বাধ্য হতেন। ফা-হিয়েন বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম সারা ভারতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে পাঞ্জাব, মথুরা এবং বাংলায় ছিল এর প্রাধান্য। ভারতের রাজা হিন্দু হলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল লক্ষণীয়। ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে পরোক্ষভাবে ছিল লক্ষণীয়। ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে পরোক্ষভাবে অনুমিত হয়, সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। মথুরার দক্ষিণাঞ্চলকে ফা-হিয়েন মধ্যদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল প্রবল। তবে ভারতের সর্বত্রই ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হতো এবং জনহিতকর কাজ ও মন্দির- মঠ নির্মাণের ব্যাপারে বিত্তশালীদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলতো।

ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে পরোক্ষভাবে অনুমিত হয়, সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল

বহির্বাণিজ্য

ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বিবরণীতে অনেক বাণিজ্যতরীর উল্লেখ আছে। সাম্রাজ্যের পূর্ব উপকূলের তাম্রলিপ্তি এবং পশ্চিম উপকূলের সোপারক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ও বন্দর ছিল। ভারতীয় বণিকগণ সিংহল ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করতেন বলে জানা যায়। এর মাধ্যমে ভারত অর্জন করতো অজস্র স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতব মুদ্রা। ফা-হিয়েন সুস্পষ্টভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নৌ-বল ও বাণিজ্যতরীর উল্লেখ করেছেন।

গুরুত্ব

ফা-হিয়েনের ভ্রমন বৃত্তান্ত 'ফো-কুয়ো-কিং' নামে পরিচিত। এটি ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য দলিল

ফা-হিয়েনের ভ্রমন বৃত্তান্ত 'ফো-কুয়ো-কিং' নামে পরিচিত। এটি ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য দলিল। বিশেষ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান উপাদান। প্রাচীনকাল থেকে চিনের সাথে ভারতের যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলছিল ফা-হিয়েনের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়। একজন বিদেশী হিসেবে ভারতের সমকালীন সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, শাসনব্যবস্থা এবং ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যে তথ্য ফা-হিয়েন দিয়েছেন, তাতে ভুল খুব একটা নেই। ভারতের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিমূর্ত এক চিত্রও তিনি এঁকেছেন।

৮৬ বছর বয়সে ফা-হিয়েন দক্ষিণ চিনে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বুদ্ধের নিকট এই বলে প্রার্থনা করেন যে, পুনর্জন্ম হলে তিনি যেন ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে গৌতমবুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারত ও দ:পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দ্বীপ সফর করে তিনি ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাটলীপুত্র, তাম্রলিপ্তি, তক্ষশীলা, সারনাথ, মথুরা, পেশোয়ার, কুশীনগরসহ বেশ কিছু প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ আছে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী থেকে গুপ্তযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় এবং পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক অবস্থার কিছু চিত্র পাওয়া যায়, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফা-হিয়েন গুপ্ত শাসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ধর্ম বিষয়ে গুপ্ত সম্রাটদের ঔদার্যে তিনি মুগ্ধ হন। সমগ্র রাষ্ট্রে তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেন। মোদ্দা কথা হলো - ফা-হিয়েনের ভ্রমণ লিপি ভারতের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য দলিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ফা-হিয়েন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন–
ক. ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ২৯৯ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ৪১০ খ্রিস্টাব্দে।

২। ফা হিয়েনের আগমনকালে ভারতের রাজা ছিলেন–
ক. সমুদ্রগুপ্ত।
খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
গ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
ঘ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

৩। 'তাম্রলিপ্তির' খ্যাতির কারণ–
ক. প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত রাজবংশ বলে।
খ. প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রাজধানী বলে।
গ. প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর বলে।
ঘ. প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত স্থল বন্দর বলে।

৪। গুপ্ত শাসনকালে ভারতের পশ্চিম উপকূলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম–
ক. তাম্রলিপ্তি।
খ. সোপারক।
গ. মথুরা।
ঘ. পাঞ্জাব।

৫। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নাম–
ক. য়্যাং-য়া-শ্যাং-লান।
খ. শীহ্‌কী।
গ. ফু-কুয়ো-কিং।
ঘ. তাও-য়ি-চি-লিয়েহ।

৬। তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়েন কাজ ছিল–
ক. পুঁথি নকল ও বৌদ্ধ বিহারের হিসেব প্রণয়ন।
খ. পুঁথি নকল ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকরণ।
গ. পুঁথি নকল ও গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ।
ঘ. পুঁথি নকল ও বৌদ্ধ মূর্তির চিত্র ও নক্‌শা অংকন।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ফা-হিয়েনের পরিচয় দিন।
২. ফা-হিয়েনের দৃষ্টিতে তৎকালীন ভারতে শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল?
৩. ফাহিয়েনের বর্ণনায় সমকালীন ভারতের জনগণের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? লিখুন।

পাঠ ৯

গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতে শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গুপ্ত শিলালিপিগুলো, বিশেষত: দামোদর লিপি, বসরা সিল লিপি, বিভিন্ন ভূমি পট্টলী, ফা-হিয়েনের বিবরণ প্রভৃতি হতে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কামন্দকের নীতিসার এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে গুপ্ত শাসনের কিছু বিক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। প্রাপ্ত এই উপাদানগুলোর সাহায্যে গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

অনেক ঐতিহাসিক গুপ্ত শাসন ব্যবস্থাকে 'প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র' বলে থাকেন

সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কেবলমাত্র সামরিক শক্তির সাহয্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে সংগঠিতও করেছিলেন। তাঁদের প্রণীত শাসন ব্যবস্থার দুটো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: গুপ্ত রাজাগণ শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনরূপ মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। তাঁরা পূর্ববর্তীকালের ঐতিহ্য ও শাসননীতির ধারা অনুসরণ করে শাসনপদ্ধতি রচনা করেন। তবে, সমসাময়িক যুগের প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা পূর্ববর্তী যুগের শাসন প্রণালীর পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত: গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল সুদক্ষ, জনহিতকর ও পক্ষপাতহীন। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও মঙ্গল সম্পর্কে গুপ্তরাজগণ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক গুপ্ত শাসন ব্যবস্থাকে 'প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র' বলে থাকেন।

রাজতন্ত্রের বিকাশ

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থায় ভারতে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত; তাঁরা 'রাজার ঐশ্বরিক শক্তির মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, ইন্দ্র ও বরুণের সমতুল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। সম্রাট পদ ছিল বংশানুক্রমিক। দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা ছিল রাজার প্রধান দায়িত্ব। রাজাই ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা, আইন প্রণয়ন করা, ন্যায় বিচার ও যুদ্ধ পরিচালনা করা রাজার নেতৃত্বেই সম্পন্ন হতো। তাঁর দ্বারাই মনোনীত মন্ত্রী ও রাজকর্মচারি দ্বারা তিনি শাসনকাজ চালাতেন। রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন ধরনের ব্যবস্থা রাজ্যে ছিল না।

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থায় ভারতে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত; তাঁরা 'রাজার ঐশ্বরিক শক্তির মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন

কেন্দ্রীয় শাসন

সুষ্ঠুভাবে শাসনকাজ পরিচালনার জন্য রাজা মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদের সাহায্য নিতেন। মন্ত্রীপদও অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক হয়েছিল। তিনজন ছিলেন মন্ত্রীবর্গের মধ্যে প্রধান - এরা হলেন প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সরকারি দলিলপত্রের সংরক্ষণকারী মন্ত্রী। উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে ছিলেন মহাবলাধিকৃত (সেনাপ্রধান), মহাপ্রতিহার (রাজপ্রাসাদের রক্ষী বাহিনীর প্রধান), মহাদন্ডনায়ক (প্রধান সেনাপতি), মহাধর্মাধ্যক্ষ (ধর্ম বিষয়ক প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত), সন্ধি-বিগ্রাহিক (আন্ত:রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও যুদ্ধ-সন্ধি বিষয়ক প্রধান পরামর্শক), অক্ষ-পটলাধিকৃত (সরকারি দলিলপত্র রচনা ও রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি) প্রমুখ। এঁদের নিচে করণিক, দৌবারিক নামে কর্মচারি ছিলেন। গুপ্ত যুগের শাসন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারিদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদ ছিল না। একই কর্মচারিকে প্রয়োজন মতো যে-কোন দায়িত্ব পালন করতে হতো।

তিনজন ছিলেন মন্ত্রীবর্গের মধ্যে প্রধান - এরা হলেন প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং সরকারি দলিলপত্রের সংরক্ষণকারী মন্ত্রী

প্রাদেশিক শাসন

শাসন ব্যবস্থা যাতে সুনিয়ন্ত্রিত থাকে সেজন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'দেশ' বা 'ভুক্তি'তে বিভক্ত করা হয়েছিল। এগুলো আবার 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সর্ব নিম্নস্তরে ছিল গ্রাম। 'দেশ' -এর প্রধান শাসক ছিলেন 'উপারিক মহারাজ'। 'বিষয়' -এর শাসনভার 'বিষয়পতি'র উপর ন্যস্ত ছিল। এদের কেউ কেউ সম্রাটের, আবার কেউ কেউ প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে থাকতেন। বহুসংখ্যক নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারি তাকে সাহায্য করতেন। গ্রামের শাসনভার ছিল 'গ্রামিক' নামক কর্মচারির উপর। গ্রাম্যসভার মাধ্যমে তিনি বিচার কাজ চালাতেন। গুপ্ত যুগে 'বিষয়' বা জেলার শাসনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। বিষয়ের শাসনকাজে পরামর্শ দেয়ার জন্য বিষয়ের অধিষ্ঠান অধিকরণে একটি পরিষদ থাকতো। এই পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিরা থাকতেন। নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ (প্রধান ব্যবসায়ী), প্রথম কুলিক (প্রধান কারিগর), প্রথম কায়স্থ (মুখ্য সচিব বা কায়স্থদের প্রধান) প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত হতো এই পরিষদ। গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রেও গ্রাম্য প্রতিনিধিদের মতামত নেয়ার রীতি চালু হয়েছিল। এই ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টতই শাসন কাজে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

গুপ্ত যুগে স্থানীয় স্বাযত্বশাসনের অবস্থা সম্মন্ধে কোন বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বড় বড় নগরে 'নিগমসভা' নামক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান যে পৌর শাসনকাজ পরিচালনা করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামে ছিল গ্রাম্যসভা; রাজকর্মচারিগণ এই সভার পরামর্শে ও সহযোগিতায় গ্রামের যাবতীয় কাজ নির্বাহ করতেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজস্ব ও পুলিশ শাসনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। কেননা, প্রায় একই ধরনের কর্মচারি এই দুই বিভাগ পরিচালনা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উপনিকা, দশপরাধিকা, দন্ডিকা, গৌলমিকা, রাজুক প্রভৃতি। গুপ্ত সাম্রাজ্যে মোটামুটিভাবে যে সকল কর প্রচলিত ছিল তা হলো 'ভাগ' বা 'ভূমিকর'। সম্ভবত: উৎপন্ন শষ্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে নির্ধারিত হতো। এছাড়া খেয়া, শুল্ক, খনি, সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উপর নিরাপত্তা কর, রাজার খাস ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি হতেও রাজকোষে অর্থ সংগৃহীত হতো। কর্মচারিদের বেতনের উপর কর ধার্য ছিল। এ করের নাম ছিল 'ভোগ'। সরকারি কাজের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম আদায় করার প্রথাও প্রচলিত ছিল; একে 'বিষ্টি' বলা হতো। সাধারণত: যুদ্ধ বা বৈদেশিক আক্রমণের সময় অতিরিক্ত কর আদায় করতে হতো। এই করের নাম ছিল 'মল্লকর'।

বিচার ব্যবস্থা

গুপ্ত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায় যে, গ্রামসভাগুলো সাধারণত: গ্রাম্যবিচারের নিষ্পত্তি করতো। বিষয় ও প্রাদেশিক শহরে ছিল সরকারি আদালত। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজার কাছে আপীল করা যেতো। ফা-হিয়েন গুপ্ত ফৌজদারী আইনের উদারতার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রদ্রোহ ছাড়া অঙ্গচ্ছেদ ছিল বিরল। সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশে বহু সংখ্যক বিচারক নিযুক্ত থাকতেন। তবে স্বয়ং রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। গুপ্ত আমলে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে জনগণ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

সামরিক সংগঠন

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হতে স্কন্ধগুপ্ত পর্যন্ত সকল গুপ্ত সম্রাট ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদী

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হতে স্কন্ধগুপ্ত পর্যন্ত সকল গুপ্ত সম্রাট ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদী। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক কৃতিত্ব নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী শাসকদের মতো গুপ্ত সম্রাটদের সামরিক বাহিনী পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তীবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে গঠিত ছিল। এছাড়া সামন্তরাজারাও যুদ্ধের সময় সাহায্য করতেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে 'মহাদন্ডনায়ক', 'মহাসন্ধি-বিগ্রাহিক', 'মহাসেনাপতি' ছিলেন প্রধান। গুপ্ত সৈন্যবাহিনীতে বংশানুক্রমিক সৈন্য ও সামন্ত বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার ও বর্শা ইত্যাদি।

এটি নিঃসন্দেহ যে, গুপ্ত সম্রাটদের সুসংগঠিত নৌ-বাহিনী ছিল। কিন্তু নৌবাহিনীর সংগঠন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তেমন কিছু জানা যায় না।

মূল্যায়ন

গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রশংসার দিক ছিল এর বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা। এর দ্বারা স্থানীয় অভাব অভিযোগের নিবারণ করা সহজ ছিল। সম্রাটের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগ থাকায় গুপ্তচর নিয়োগ করে তাঁকে খবর জোগাড় করতে হতো না। শাসনব্যবস্থা উদারপন্থী হওয়ায় জনগণ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মৌর্য যুগে ভারতে যে শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার অনেকটাই গুপ্ত যুগেও দেখা যায়। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার সাথে মৌর্য শাসন ব্যবস্থার একটি মৌলিক প্রভেদ এই যে, কেন্দ্রের নীতির বিরোধী না হলে প্রদেশ বা বিষয়ের শাসনকর্তারা স্থানীয়ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করতেন। কেন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ করতো না। মৌর্যযুগে এটা ছিল অসম্ভব। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এই শাসন পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পদে বংশানুক্রমিক নিয়োগ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের সংহতি ও শক্তি সুরক্ষিত করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। ক্রমেই বিভেদকামী শক্তিগুলো উৎসাহিত হয়। তাছাড়া গুপ্ত শাসনে গ্রাম ও বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবার ফলে নগর-সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। অনেকেই বলেন, গুপ্ত শাসনব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রী, তাই জনসংযোগ তেমন প্রত্যক্ষভাবে স্থাপিত হয়নি। এই সমালোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত শাসনপ্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত। গুপ্ত যুগের বিচার ব্যবস্থা ছিল উদার ও মানবধর্মী। শাসনপ্রণালীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত: গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও মৈত্রীসংঘের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাই প্রাচীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে গুপ্তদের অবদান অনস্বীকার্য।

গুপ্ত শাসনপ্রণালী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয়বারের মতো সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় গুপ্ত আমলে। সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে একে সংগঠিতও করেছিলেন। বিশালত্বের কারণে একটি কেন্দ্র থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করা বেশ কঠিন ছিল। তাই একে কয়েকটি প্রদেশে (দেশ, ভুক্তি ইত্যাদি) ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশগুলি আবার জেলায় বা বিষয়ে বিভক্ত হতো। উপরিক ছিলেন প্রদেশের শাসক। জেলার শাসক ছিলেন বিষয়পতি। শাসন ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতর বিভাগ গ্রাম শাসন করতেন গ্রামিক। নগর শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ প্রমুখকে নিয়ে বিষয় অধিকরণে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে জনগণের এই সংযোগ স্থাপনে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাটের প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চলের বাইরে ছিল সামন্তরাজ্য। এরা সম্রাটের অনুগত থাকতেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করতেন। যতোদূর জানা যায়, দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। মৌর্য যুগের তুলনায় গুপ্ত যুগে দন্ডনীতি ছিল অনেক লঘু এবং মানবিক।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন : ৭.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভুক্তির প্রধানকে বলা হতো–
   ক. বিষয়পতি।
   খ. গ্রামিক।
   গ. উপারিক।
   ঘ. ভুক্তিপতি।

২। কর্মচারিদের বেতনের উপর ধার্যকৃত করের নাম–

ক. ভোগ।
খ. বিষ্টি।
গ. ভাগ।
ঘ. মল্লকর।

৩। অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো হতো–
ক. রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে।
খ. ডাকাতি করার অপরাধে।
গ. রাজস্ব প্রদান না করার অপরাধে।
ঘ. চুরি করার অপরাধে।

৪। 'মহাপ্রতিহার' পদধারী ছিলেন–
ক. ধর্ম বিষয়ক প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
খ. প্রধান সেনাপতি।
গ. যুদ্ধ-সন্ধি বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা।
ঘ. রাজপ্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর প্রধান।

৫। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মন্তব্যটি হচ্ছে–
ক. স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।
খ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।
গ. প্রজাহিতৈষী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।
ঘ. প্রজাকল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থা।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. গুপ্ত যুগের রাজতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন।
৩. গুপ্তযুগের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল- সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
৪. গুপ্ত-যুগের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ ১০

গুপ্ত যুগের সংস্কৃতি ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের 'ধ্রুপদী যুগ' সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গুপ্ত যুগে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং বহির্বিশ্বের সাথে গুপ্ত সংস্কৃতির যোগাযোগ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

গুপ্ত সংস্কৃতি

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গুপ্ত শাসনকাল ছিল ভারতের এক গৌরবময় যুগ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনই এযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি এই যুগকে মহিমান্বিত করে তুলেছিল। অনেকেই গুপ্ত যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব অগ্রগতির জন্য একে 'ক্ল্যাসিকাল যুগ' বা 'ধ্রুপদী যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার মনে করেন, গুপ্ত যুগ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা ছিল উচ্চ শ্রেণীকেন্দ্রিক। তাঁর মতে, গুপ্ত যুগের সভ্যতা ছিল একান্তই 'দরবারি সভ্যতা'। ঐতিহাসিক বার্ণেট গুপ্ত যুগকে গ্রিসের পেরিক্লিসের যুগের সাথে তুলনা করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লিস এথেন্সের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁর যুগে এথেন্সে জন্মলাভ করেছিলেন যেমন- ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস প্রমুখ নাট্যকার, ভাস্কর ফিডিয়াস ও স্থপতি ইক্টিলাস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে পেরিক্লিসের যুগকে যেমন গ্রিক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয় তেমনি গুপ্ত যুগকেও বলা হয় ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। গুপ্ত যুগে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে পেরিক্লিসের যুগের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

অনেকেই গুপ্ত যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব অগ্রগতির জন্য একে 'ক্ল্যাসিকাল যুগ' বা 'ধ্রুপদী যুগ' বলে অভিহিত করেছেন

ধর্মীয় অবস্থা

অশোক এবং কনিষ্কের ইতিহাস পড়ার সময় আপনারা জেনেছেন যে, তখন বৌদ্ধ ধর্ম ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং এ ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম বা জৈন ধর্ম তখনও বিলুপ্ত হয়নি। মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতি অনুযায়ী অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন করতো। সুতরাং গুপ্ত যুগে 'হিন্দু সংস্কৃতির নবজন্ম' বা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল এমন কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে গুপ্ত শাসকগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিলেন একথা বলা যেতে পারে। গুপ্ত যুগের ধর্মীয় অবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রাচীন বৈদিক ধর্মের ধীরে ধীরে কতকটা আধুনিক হিন্দু ধর্মে রূপান্তর। এসময়ই বৈদিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্যান্য বহু নতুন দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হতে থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি পূজা এই নতুন ধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। গুপ্ত যুগে হীনযান বৌদ্ধ মতের প্রভাব ক্রমশ: কমতে থাকে এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় মহাযান মতের। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষের সর্বত্র জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেরই পতন শুরু হয়। এই অবনতির প্রধান কারণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। তবে একথা বলার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, গুপ্ত রাজারা মনে-প্রাণে হিন্দু হলেও অন্য কোন ধর্মের উপর তাঁরা অত্যাচার করেন নি।

গুপ্ত রাজারা মনে-প্রাণে হিন্দু হলেও অন্য কোন ধর্মের উপর তাঁরা অত্যাচার করেন নি

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের স্থান নি:সন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি এবং সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষের জন্য গুপ্ত যুগ সুবিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উভয়েই সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ বীরসেন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'র ভাষা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং উপভোগ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে যদি 'কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য' বলে গণ্য করা হয়, তবে একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন ভারতের

অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি এবং সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষের জন্য গুপ্ত যুগ সুবিখ্যাত

ইতিহাসে সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যোৎসাহী রাজগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান। গুপ্ত যুগের সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। মৌর্য যুগে সংস্কৃত ভাষা সরকারি ভাষা ছিল না; কিন্তু তখনও এ ভাষার চল ছিল। গুপ্ত সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অন্যান্য অনুকূল কারণে গুপ্ত যুগে এ ভাষার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগের অধিকাংশ শিলালিপি ও সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সীমিত। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচনার অভাব চোখে পড়ার মতো। উচ্চ শ্রেণীর জন্য বিনোদনমূলক সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় বহু রচিত হয়েছে। গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকার ছিলেন মহাকবি কালিদাস। নাটক, কাব্য, গীতিকাব্য সব ক্ষেত্রেই কালিদাসের প্রতিভার পরিচয় মেলে। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্র ইত্যাদি। এছাড়া শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির কথা না বললেই নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে কেমন উচ্চমার্গীয় নাটক লেখা হতো মৃচ্ছকটিক তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' এবং 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম' নাটকের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অনেকেই মনে করেন বিশাখদত্ত গুপ্ত যুগের লোক ছিলেন। অপর কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হচ্ছেন বিষ্ণু শর্মা, দন্ডিন, সুবন্ধু, অমরসিংহ প্রমুখ। গুপ্ত যুগ ধর্মীয় সাহিত্যের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগেই মহাভারত ও পুরাণগুলির এক বিরাট সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়। এই সম্পাদনা এমনভাবে করা হয় যা সম্পূর্ণ নতুন এক সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। অনেকের মতে, মহাভারত ও পুরাণগুলির নবসম্পাদনা ও রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি সাধন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা। কিন্তু গুপ্ত যুগের পরেও প্রায় ৪০০ বছর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। তাই মনে হয় ভারতীয় জীবন হতে কুষাণ, গ্রিক, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলোর প্রভাব দূর করার জন্যই সম্ভবতঃ গুপ্ত রাজগণ উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং মহাভারত ও পূরাণগুলি নব সম্পাদনা করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সীমিত। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচনার অভাব চোখে পড়ার মতো

শিক্ষার অগ্রগতি ও বিশ্ববিদ্যালয়

গুপ্ত যুগে ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। নালন্দা, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সারনাথ এবং অজন্তা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পড়াশুনার অগ্রগতি দেখা যায়। বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সারা ভারতে বিখ্যাত। এখানে মহাযান বৌদ্ধমতের উপর বিশেষভাবে পড়ানো হতো। এছাড়া ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়েও শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। পাণিনি, কৌটিল্য, চরক প্রমুখ পন্ডিতজন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এছাড়া গুজরাট অঞ্চলে অবস্থিত বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অসংখ্য স্থানে গুপ্ত আমলে শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। গুপ্ত শাসকগণ এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সারা ভারতে বিখ্যাত

উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। গুজরাট অঞ্চলে অবস্থিত বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

গুপ্ত যুগে কাব্য ও দর্শনের ন্যায় বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দেখা যায়। পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয়রা বেশ উন্নতি করেছিলেন। বাগভট্ট নামে একজন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বিখ্যাত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বরাহমিহির রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে দিক নির্দেশক। মহাপন্ডিত আর্যভট্টকে অনেকেই 'ভারতীয় নিউটন' বলে মনে করেন। আর্যভট্টই প্রথম মন্তব্য করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এভাবে তিনি আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিও আবিষ্কার করেন। অংকশাস্ত্রের উন্নতির জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নি:সন্দেহভাবে গৌরব দাবী করতে পারেন। বলা হয়ে থাকে, জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য জগত ভারতের কাছেই ঋনী। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও গুপ্ত যুগে প্রভূত উন্নতি হয়। সে সময় শব-ব্যবচ্ছেদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় পাঠ ছিল।

পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয়রা বেশ উন্নতি করেছিলেন

মহাপন্ডিত আর্যভট্টকে অনেকেই 'ভারতীয় নিউটন' বলে মনে করেন

গুপ্ত যুগের শিল্পকলা

শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের অগ্রগতি তার সাহিত্যিক অগ্রগতির মতোই বিস্ময়কর। এই যুগকে ভারতীয় শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের যুগ বলা যেতে পারে। মথুরা, বারাণসী ও পাটলীপুত্র ছিল শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন - এই তিনটি পরস্পর ঘনিষ্ট মাধ্যমে গুপ্ত যুগীয় শিল্পকলার প্রসার ঘটেছিল।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য শিল্পের নতুন যুগ শুরু হয়। আগের যুগের স্থাপত্য ধারার সঙ্গে গুপ্ত যুগের নবধারা মিশে এক নবতর বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায় গুপ্ত যুগের গুহামন্দিরগুলোর নির্মাণ কৌশলে। অজন্তা, ইলোরা, বাগ গুহার নির্মাণে পাহাড় কেটে চৈত্য ও বিহার তৈরীর কৌশল গুপ্তযুগেই আবিষ্কৃত হয়। এযুগে মন্দির স্থাপত্যের বিশেষ শৈলী রচিত হয। মন্দির তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয় ইট, পাথর ইত্যাদি স্থায়ী উপাদান। সাধারনভাবে বলা হয়ে থাকে, গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম মন্দিরের চূড়া উচুঁ করে তৈরি করা শুরু হয়। এছাড়া এযুগের মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড়-রীতি ও নাগর রীতির লক্ষ্যণীয় প্রভাব বিদ্যমান।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য শিল্পের নতুন যুগ শুরু হয়। আগের যুগের স্থাপত্য ধারার সঙ্গে গুপ্ত যুগের নবধারা মিশে এক নবতর বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়

গুপ্ত সম্রাটদের ভাস্কর্য কলা নি:সন্দেহে নৈপুণ্যের উন্নত শিখরে আরোহন করেছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের দুটো প্রধান কেন্দ্র মথুরা ও সারনাথ। বারানসীর নিকটস্থ সারনাথ 'গুপ্ত যুগের মূর্তি ও অন্যান্য শ্রেণীর ভাস্কর্যের ভান্ডার' বলে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলো শিল্পকলার দিক হতে খুবই উচ্চস্তরের এবং সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণের সমসাময়িক। এসব ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্মের এবং পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এখানে উভয় ধর্মের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে। মূর্তিসমূহের আকৃতিগত সৌন্দর্য ও মর্যাদার অভিব্যক্তি এবং তাদের রূপায়ণে শিল্পীর সংযত ও মার্জিত রুচি ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে অতুলনীয়।

গুপ্ত সম্রাটদের ভাস্কর্য কলা নি:সন্দেহে নৈপুণ্যের উন্নত শিখরে আরোহন করেছিল

গুপ্ত চিত্রকলার অভূতপূর্ব বিকাশ অজন্তার গুহার গায়ে দেখা যায়। গুপ্ত যুগের চিত্রকলা ধর্মীয় বিষয়কে অতিক্রম করে মানুষের জীবনের নানাদিক নিয়ে রচিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের জীবনকে অবলম্বন করেও বহু প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়। অজন্তা ছাড়া বাগ গুহার চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু বিশেষ করে নর-নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বিশেষ উল্লেখ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল শিল্প বিশেষজ্ঞ গুপ্ত চিত্রকলার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গুপ্ত যুগের চিত্রকলা ধর্মীয় বিষয়কে অতিক্রম করে মানুষের জীবনের নানাদিক নিয়ে রচিত হয়েছিল

গুপ্ত যুগের শিল্পী ও কারিগরগণ ধাতুশিল্পে চমকপ্রদ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। দিল্লীর লৌহনির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটি সম্ভবত: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নির্মিত। বহু শতাব্দী ধরে রোদ ও বৃষ্টি সত্ত্বেও এতে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরেনি। তামা ঢালাই করে মূর্তি নির্মাণের কাজেও এযুগের শিল্পীগণ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাগুলো প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা নির্মাণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কুম্ভকারগণের শিল্পকর্মও ছিল বেশ উন্নত মানের।

গুপ্ত যুগের শিল্পী ও কারিগরগণ ধাতুশিল্পে চমকপ্রদ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন

গুপ্ত সংস্কৃতির বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ

গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের সাথে বহির্বিশ্বের গভীর যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সাথে গুপ্ত সংস্কৃতির আদান-প্রদান এযুগের বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুপ্ত যুগে চিনের সাথে ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। শিলালিপি ও সাহিত্যের সাক্ষ্য হতে জানা যায় যে, গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের সাথে মালয় উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় নাবিকদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উদ্যোগে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে নীত হয়েছিল। ঐতিহাসিক জি, কোয়েডেস বলেছেন, 'দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় গুপ্ত শাসন ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান'। এছাড়া কুষাণ আমল হতে রোমের সাথে ভারতের যে সম্মন্ধ স্থাপিত হয়েছিল গুপ্ত আমলেও তা বজায় ছিল বলে অনুমান করা হয়। বিশেষ করে গুপ্ত মুদ্রায় রোমক

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সাথে গুপ্ত সংস্কৃতির আদান-প্রদান এযুগের বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

গ্রিস, রোম, চিন এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার শৈল্পিক প্রভাব গুপ্ত সংস্কৃতিকে নব-বৈশিষ্ট্য দান করেছিল

প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। তাই বলে গুপ্ত সংস্কৃতিই কেবলমাত্র বহির্বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে এমন চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নয়; গুপ্ত সংস্কৃতির উপরও লক্ষণীয়ভাবে পড়েছিল বৈদেশিক প্রভাব। গ্রিস, রোম, চিন এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার শৈল্পিক প্রভাব গুপ্ত সংস্কৃতিকে নব-বৈশিষ্ট্য দান করেছিল।

গুপ্ত যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলা কি সংগত?

উপরের সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্ত যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলা সঙ্গত: কিনা তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। গুপ্ত যুগে দীর্ঘকাল ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তি মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ন ছিল। সাম্রাজ্যের সংহতি ও ঐক্য বিধানেও গুপ্ত শাসকরা বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। এছাড়া গুপ্তদের উদারপন্থী শাসন ব্যবস্থা, লৌকিক হিন্দু ধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণু নীতির বিস্তার, সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-দর্শন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য বিকাশের কারণে অনেক ঐতিহাসিক গুপ্তযুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করেন। ইদানিং আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই চিন্তার বিপরীতেও যুক্তি দিতে শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রশংসার দিক থাকলেও এর ছিল কতোগুলো দুর্বল দিক। প্রদেশ ও জেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় শাসনকর্তারা ক্ষমতালোভী হয়ে পড়েন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বভারতীয় আবেদন ক্রমেই ভেঙ্গে যায়। এছাড়া নগরগুলোর ধ্বংসোন্মুখিতা, জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য, উচ্চ শ্রেণীর জন্য বিনোদন সাহিত্য লোক সংস্কৃতির অভাব-ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার বিস্তার, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের রুচির প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে গুপ্ত যুগকে প্রশ্নাতীতভাবে 'স্বর্ণযুগ' বলা চলে না। তবুও সকল ব্যতিক্রম-বিচ্যুতি মেনে নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত যুগের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল অসাধারণ। শাসন ব্যবস্থা এবং সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাপ অবশ্যই পড়েছিল।

সকল ব্যতিক্রম-বিচ্যুতি মেনে নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত যুগের সামগ্রিক অগ্রগতি ছিল অসাধারণ

সার-সংক্ষেপ

উদারপন্থী শাসন ব্যবস্থা, সাহিত্য ও শিল্পের অসাধারণ অগ্রগতি এবং জনসাধারণের স্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে অনেকেই গুপ্তযুগকে 'ধ্রূপদী সংস্কৃতির যুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সত্ত্বেও সাধারণভাবে উদারনীতি অনুসরণ, সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজপৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, বিজ্ঞানচর্চায় গৌরব অর্জনসহ শিল্পকলা মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ এবং বহির্বিশ্বের সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগকে গৌরবদীপ্ত করেছে। এই গৌরব এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, গুপ্ত রাজারা সমগ্র ভারতের উপর তাঁদের ক্ষমতা নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি সত্য, কিন্তু এই সাম্রাজ্যের মহিমা সমগ্র ভারতে তো বটেই, এমনকি বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক সংহতি ও সুশাসনের সাথে এই সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব গুপ্ত শাসনকে ইতিহাসে মহিমান্বিত করেছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য ও শাশ্বত রূপ পরিলক্ষিত হয় তা গুপ্ত যুগের এই সাংস্কৃতিক গৌরবগাঁথার মধ্যে অনেকাংশেই মিশে ছিল - একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১০

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। পেরিক্লিস ছিলেন–
   ক. খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে স্পার্টার নেতা।
   খ. খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অব্দে এথেন্সের নেতা।
   গ. খ্রিস্টীয় পঞ্চম অব্দে এথেন্সের নেতা।
   ঘ. খ্রিস্টীয় পঞ্চম অব্দে স্পার্টার নেতা।

২। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবনতির প্রধান কারণ–
   ক. গৌতম বুদ্ধের ইহধাম ত্যাগ।
   খ. অশোকের নতুন ধর্ম (ধম্ম) প্রচার।
   গ. বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ।
   ঘ. গুপ্ত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

৩। কালিদাস রচিত সাহিত্য নয়–
ক. শকুন্তলা।
খ. রঘুবংশ।
গ. মুদ্রারাক্ষস।
ঘ. মেঘদূত।

৪। শূদ্রক রচিত বিখ্যাত নাটক–
ক. দেবীচন্দ্র গুপ্তম।
খ. মৃচ্ছকটিক।
গ. মুদ্রারাক্ষস।
ঘ. অনর্ঘরাঘব।

৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত–
ক. তক্ষশীলায়।
খ. গুজরাটে।
গ. সারনাথে।
ঘ. বিহারে।

৬। 'ভারতীয় নিউটন' নামে খ্যাত পন্ডিতের নাম–
ক. বাগভট্ট।
খ. আর্যভট্ট।
গ. বরাহ মিহির।
ঘ. পাণিনি।

৭। গুপ্ত আমলে ভারতীয় প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়–
ক. গ্রিস ও রোমে।
খ. ইউরোপে।
গ. দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার।
ঘ. চিন দেশে।

৮। গুপ্ত শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র সমূহ–
ক. তক্ষশীলা, নালন্দা ও উজ্জয়িনী।
খ. বল্লভী, পাটলীপুত্র ও নালন্দা।
গ. পাটলীপুত্র, মথুরা ও বারাণসী।
ঘ. বারাণসী, নালন্দা ও তক্ষশীলা।

৯। গুপ্ত আমলে মন্দির স্থাপত্যে যে রীতির প্রভাব পড়েছিল–
ক. পূর্ব ভারতীয় রীতি।
খ. গান্ধার রীতি।
গ. গ্রিক রীতি।
ঘ. দ্রাবিড় ও নাগর রীতি।

১০। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক নির্দেশক গ্রন্থের নাম–
ক. মৃচ্ছকটিক।
খ. কুমারসম্ভব।
গ. মালবিকাগ্নিমিত্র।
ঘ. পঞ্চসিদ্ধান্ত।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতে, "ধ্রুপদীযুগ" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. গুপ্ত যুগের ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. "ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের" উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
৪. গুপ্ত যুগে ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৫. আপনি কি গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের 'স্বর্ণযুগ' মনে করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ ১১

পুষ্যভূতি বংশ - হর্ষবর্ধন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী রাজবংশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

পুষ্যভূতি বংশের পরিচয় ও উত্থান

পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বর অঞ্চলে সম্ভবত: ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুষ্যভূতি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়

পুষ্যভূতি বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত থানেশ্বর অঞ্চলে সম্ভবত: ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে পুষ্যভূতি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। হূন আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে পাঞ্জাব রক্ষা করে তিনি খ্যাতি

অর্জন করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধী গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়। প্রভাকরবর্ধনের নেতৃত্বে পুষ্যভূতি রাজবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে ভারতে চতুর্থবারের মতো এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পূর্বের পাঠগুলো হতে আপনারা জেনেছেন যে, প্রাচীন ভারতে রাজবংশগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ছিল রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন যুগধর্ম অনুসারে প্রভাকর বর্ধনও কনৌজের মৌখরী বংশের সাথে বৈবাহিকসূত্রে মিত্রতা স্থাপন করেন। মৌখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। এভাবে উদ্ভব হয় উত্তর ভারতে পুষ্যভূতি-মৌখরী শক্তিসমবায়ের। এই শক্তিসমবায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্ক এবং মালবরাজ দেবগুপ্ত। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর সিংহাসনে বসেন জৈষ্ঠ্যপুত্র রাজ্যবর্ধন। এদিকে মালব-গৌড় শক্তিজোট থানেশ্বরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। তারা কনৌজের গ্রহবর্মনকে নিহত করেন এবং বন্দী করেন রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে। রাজ্যবর্ধন বোনকে উদ্ধারের জন্য কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাস্ত করেন। কিন্তু গৌড় তথা বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি শশাংকের হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। এমনি পরিস্থিতিতে রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন সম্ভবত: ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। ৬১২ খ্রিস্টাব্দের দিকে থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যদুটিকে সংযুক্ত করে হর্ষবর্ধন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিরাট একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর সময় হতেই কনৌজ আর্যাবর্তের প্রধান নগর ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

হর্ষবর্ধন ঃ ইতিহাসের উপাদান

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। হর্ষবর্ধন তথা সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি উৎস থেকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং-এর রচনা 'সি-ইউ-কাই', হিউয়েন সাং-এর জীবনীগ্রন্থ, বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' এবং সমসাময়িক মুদ্রা ও লিপিমালায় মূল্যবান তথ্য বিধৃত আছে। বাঁশখেরা তাম্রপট্ট, নালন্দা শীল, সোনাপৎ তাম্রপট্ট, মধুবণী তাম্রপট্ট, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি ইত্যাদি সমকালীন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজ্যসীমা

সিংহাসনে বসার পরপরই হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গৌড়রাজ শশাংকের বিরুদ্ধে তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সাথে স্থাপন করেন মিত্রতা। এই মিত্রতা স্থাপন খুবই কার্যকর হয়েছিল। এর ফলে পূর্বদিক হতে ভাস্করবর্মা এবং পশ্চিম দিক হতে হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাংকের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু যতোদূর জানা যায়, জীবদ্দশায় শশাংককে তাঁরা পরাজিত করতে পারেন নি। শশাংকের মৃত্যুর পর সম্ভবত: ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন এবং হর্ষবর্ধন মগধ জয় করে 'মগধরাজ' উপাধী গ্রহণ করেছিলেন। হর্ষবর্ধন কেবলমাত্র পূর্ব ভারতে রাজ্য বিস্তার করেননি। পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যও তিনি অধিকার করার চেষ্টা করেন। গুজরাটের গুর্জর ও রাজপুতানার মালবদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বৈরী। বাণভট্টের দেয়া তথ্য অনুসারে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন হর্ষবর্ধন সিন্ধু, নেপাল এবং কাশ্মীরে অভিযান চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধেও হর্ষ যুদ্ধাভিযান করেন বলে জানা যায়। বাণভট্টের মতে, হর্ষবর্ধন 'পঞ্চ ভারত' (কনৌজ, বাংলা, দ্বারা ভাঙ্গা, পাঞ্জাব ও উৎকল) -এর সাহায্য নিয়ে বিরাট সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে যান। তিনি নর্মদা পার হয়ে পুলকেশীর রাজ্যে ঢুকে পড়লে যুদ্ধ শুরু হয়। খুব সম্ভবত এই যুদ্ধে হর্ষবর্ধন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। তবে সামগ্রিকভাবে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা এবং গঞ্জাম নিয়ে বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন; একথা বলা যেতে পারে। চালুক্য লিপিগুলোতে হর্ষকে 'সকলোত্তরপথ-নাথ' (সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হর্ষ কখনও সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বলে জানা যায় না।

সামগ্রিকভাবে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা এবং গঞ্জাম নিয়ে বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন

এখন সংক্ষেপে হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাক। হর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে থানেশ্বর বা পূর্ব পাঞ্জাবের অধিকার পান। বোনের বৈবাহিক সূত্রে তিনি কনৌজের বা উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চল ও সংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মগধ বা বিহার, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম বা কংগদ জয় করেন। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের কিছু ক্ষুদ্র শক্তির উপর হর্ষের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তাঁকে 'উত্তর ভারতের অধিরাজ' বলা সঙ্গত নয়। মোদ্দা কথা হলো পূর্ব পাঞ্জাব হতে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল তাঁর পতাকার অধীনে।

শাসন ব্যবস্থা

ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে, মৌর্যদের মতো কোন কেন্দ্রীয় শাসন হর্ষবর্ধন স্থাপন করতে পারেননি। তাঁর অধীনে সামন্ত রাজারা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতেন। হর্ষ রাজ্যের সমুদয় কাজ নিজেই তত্ত্বাবধান করতেন। তবে পরামর্শের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল। সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল 'ভুক্তি', 'বিষয়' ইত্যাদি ইউনিটে। শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম। দেশে তখন অপরাধ কিছুটা বেড়েছিল। সেই সাথে কঠোর করা হয়েছিল দন্ডবিধি। উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজকর হিসেবে নেয়া হতো। জনহিতকর কাজ যেমন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিশ্রামাগার নির্মাণ এবং শিক্ষা বিস্তারে হর্ষবর্ধন তৎপর ছিলেন।

ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে, মৌর্যদের মতো কোন কেন্দ্রীয় শাসন হর্ষবর্ধন স্থাপন করতে পারেননি

ধর্মীয় অবস্থা

প্রথম জীবনে হর্ষবর্ধন ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী। কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে তিনি মহাযান বৌদ্ধ মতের অনুরাগী হয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি হর্ষ কেবলমাত্র সহিষ্ণুই ছিলেন না, রীতিমতো শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। তিনি প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্মজ্ঞানীদের বিতর্ক শুনতেন এবং তাঁদেরকে পুরস্কৃত করতেন। অশোকের মতো তিনিও রাজ্যের মধ্যে অসংখ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ পন্ডিত এবং জৈন শ্রমণদেরকে মুক্তহাতে দান করতেন বলে জানা যায়। গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলে প্রতি ৫ বছর পর পর 'প্রয়াগের দান মেলা' আহবান করা হতো। এখানে বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা চলতো। এটি নি:সন্দেহে হর্ষের অতি উন্নত মানসিকতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় বহন করে। নাট্যকার হিসেবেও হর্ষের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' এবং 'নাগানন্দ' নামে তিনটি বিখ্যাত নাটকের তিনি রচয়িতা বলে মনে করা হয়।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব

হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী রাজত্ব করার পর সম্ভবত: ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। হর্ষের রাজসভায় কবি বাণভট্ট এবং তাঁর গুণগ্রাহী চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং তাঁর সম্পর্কে বহু প্রশস্তি রেখে গেছেন। গুণমুগ্ধ সভাকবি হিসেবে বাণভট্টের রচনায় পক্ষপাত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। একই সাথে হর্ষ কর্তৃক উপকৃত হিউয়েন সাং - এর বিবরণেরও অতিশয়োক্তি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে এদিকে সতর্ক থাকা দরকার। হর্ষবর্ধনের প্রথম কৃতিত্ব বোন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রতিরোধ জোটের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ। সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। অনেকেই তাঁকে প্রাচীন ভারতের শেষ 'সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট' বলেন। হর্ষের শাসনব্যবস্থায় বিরাট কোন পরিবর্তন থাকলেও থানেশ্বরের এক ক্ষুদ্র রাজ্যকে উত্তর ভারতীয় চরিত্র দান করে তিনি তাঁর শাসন প্রক্রিয়ার মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী সম্রাট। ধর্মসহিষ্ণু নীতির ধারক বাহক হিসেবে তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর দানশীলতা তুলনাহীন। সাহিত্যরসিক এবং বিদ্যানুরাগী হিসেবে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত নাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যুদ্ধ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মী কার্যকলাপের মধ্যে হর্ষবর্ধন যে কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন তার মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত ও অশোকের নীতি ও কার্যকলাপের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়। ঐতিহাসিক আর, কে, মুখার্জী এ বিষয়ে বলেন, 'হর্ষের চরিত্রে সমুদ্রগুপ্তের সমরকুশলতা ও অশোকের প্রজাহিতৈষণার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি মহান সম্রাট আকবরের ন্যায় ছিলেন একাধারে সাম্রাজ্যবাদী ও উদার ধর্মনীতির অনুসরণকারী।'

হর্ষবর্ধনের প্রথম কৃতিত্ব বোন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং গৌড়রাজ শশাঙ্কের প্রতিরোধ জোটের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ। সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না

সার-সংক্ষেপ

ভারতে চতুর্থবারের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কৃতিত্ব পুষ্যভূতি বংশের। এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধনের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। হর্ষ কনৌজ এবং থানেশ্বরকে যুক্ত করেন এবং নিজ সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বর্ধিত করেন। বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং হর্ষের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রজাকল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। হর্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি নিজে কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। সম্ভবত: ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়। কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর থানেশ্বর রাজ্য আক্সলহ ও গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যকেন্দ্রিক ইতিহাসে হর্ষবর্ধনই শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। পুষ্যভূতি বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক–
ক. গ্রহবর্মন।
খ. প্রভাকরবর্ধন।
গ. হর্ষবর্ধন।
ঘ. রাজ্যবর্ধন।

২। থানেশ্বরের অনুকূলে গড়ে ওঠা শক্তিজোই–
ক. মালব-গৌড় শক্তিজোট।
খ. মালব-থানেশ্বর শক্তিজোট।
গ. শশাংক-গুপ্ত শক্তিজোট।
ঘ. পুষ্যভূতি-মৌখরী শক্তিজোট।

৩। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আগমনকারী বিখ্যাত চৈনিক পর্যটকের নাম–
ক. ফা-হিয়েন।
খ. মা-তোয়ান-লিন।
গ. হিউয়েন সাং।
ঘ. শেং-চি।

৪। ভাস্করবর্মন ছিলেন–
ক. শশাংকের মিত্র, মালবের রাজা।
খ. শশাংকের শত্রু, থানেশ্বরের রাজা।
গ. হর্ষবর্ধনের মিত্র, কামরূপের রাজা।
ঘ. হর্ষবর্ধনের শত্রু, গৌড়ের রাজা।

৫। 'পঞ্চ ভারত' বলতে যে ৫টি রাজ্য বোঝায়–
ক. কনৌজ, বল্লভী, মগধ, উৎকল ও থানেশ্বর।
খ. কনৌজ, বাংলা, দ্বারভাঙ্গা, পাঞ্জাব ও উৎকল।
গ. কনৌজ, দ্বারা ভাঙ্গা, বল্লভী, মগধ ও কামরূপ।
ঘ. কনৌজ, বাংলা, পাঞ্জাব, থানেশ্বর ও চালুক্য।

৬। 'সকলোত্তর পথ-নাথ' অর্থ–
ক. উত্তরাঞ্চলের অধিরাজ।
খ. উত্তরাঞ্চলের ত্রাণকর্তা।
গ. উত্তরাঞ্চলের পথিক।
ঘ. উত্তরাঞ্চলের পরমেশ্বর।

৭। 'রত্নাবলী' রচনা করেন–
ক. বাণভট্ট।
খ. কালিদাস।
গ. হর্ষবর্ধন।
ঘ. শশাংক।

৮। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাং - এর রচনার প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে–
ক. ভাষার অলংকার বাহূল্য।
খ. ধারাবাহিক বিবরণ নয়।
গ. সন-তারিখের গরমিল।
ঘ. বর্ণনায় পক্ষপাতিত্ব।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতে পুষ্যভূতি বংশের পরিচয় ও উত্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. হর্ষবর্ধনের ধর্মনীতি আলোচনা করুন।
৩. হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ বিগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৪. হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল- উল্লেখ করুন।
৫. ভারতের ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

পাঠ ১২

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদেশিক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন যুগে শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিপর্ব

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হিসেবে সিন্ধু সভ্যতার কথা বলা যেতে পারে। বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হতে বা আর্যদের আগমনের পর থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে এং প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্যদের আগমনের হাজার বছর পূর্বেই এ অঞ্চল এক উচ্চ-মানের সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদীর ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের (যথা মিশরীয় বা সুমেরীয়) সমসাময়িক।

আর্যদের আগমনের হাজার বছর পূর্বেই এ অঞ্চল এক উচ্চ-মানের সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর এ অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রভাব যথেষ্টভাবে পড়েছে। সে কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা খুব বেশি কঠিন নয়। বিভিন্ন সময় বিদেশীদের আক্রমণ এবং তাদের দেশ শাসনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর বহির্দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে। আবার ভারতীয় সংস্কৃতিও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া এবং চিনসহ অনেক দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। এভাবে মিলন-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এবং ভারতীয় অঞ্চলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত রেখে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির ধারা বজায় থেকেছে। হরপ্পা ও মহেন্‌জোদারো সংস্কৃতির ধারা বৈদিক যুগ অতিক্রম করে, মৌর্য ভারতের জনকল্যাণমুখিতা ও ধর্মীয় উদারতাকে ধারণ করে, কুষাণ যুগের শৈল্পিক কৃতিত্বকে লালন করে, গুপ্ত যুগের ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে বহন করে এবং পুষ্যভূতি বংশের ধর্ম-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদানকে স্বীকার করে নিয়ে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে।

সিন্ধু সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ। হরপ্পা ও মহেন্‌জোদারো হতে ২ হাজার শীলমোহর আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। এর রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহনির্মাণের বিশেষ পদ্ধতি, দুর্গ-বেষ্টনি, শস্যাগার ও সভাগৃহ নির্মাণ, স্নানাগার এবং পয়:প্রণালী ব্যবস্থা ছিল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় ভারতে সে সময় সুসংগঠিত নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আরো অনুমান করা হয় যে, পশ্চিম এশিয়ার সুমেরিয় ও অন্যান্য সভ্যতার সাথে প্রাচীনকালে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ

বৈদিক সভ্যতা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার পর বৈদিক সভ্যতার কথা বলতে হবে। সিন্ধু সভ্যতার মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে বৈদিক আর্য জাতি ও বৈদিক সভ্যতার অবদান একেবারে কম ছিল না। আর্যরা ভারতে আসার পর প্রথমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাবে বসবাস স্থাপন করে। এরপর ক্রমেই আর্য সংস্কৃতির দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী বিস্তার সম্পন্ন হয় এবং ভারতে বিকশিত হয় আর্য সংস্কৃতি। ঋকবেদের যুগ এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির বিরোধ-মিলন সংঘঠিত হয়। সামাজিক আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, অর্থনৈতিক জীবন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সময় কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবর্তন ও বিকাশ, সমাজে বর্ণ ও জাতিভেদ

সিন্ধু সভ্যতার মতো গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে বৈদিক আর্য জাতি ও বৈদিক সভ্যতার অবদান একেবারে কম ছিল না

প্রথার প্রভাব ও কৌম সমাজ থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বাভাষ এই যুগেই ঘটে। আরো ঘটে অনার্য ভাষার বিকাশ। এভাবেই আর্য-অনার্য জাতির পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সহাবস্থানের ফলে ভারতে নতুন এক শক্তিশালী সভ্যতা বিকাশ লাভ করে - এভাবেই রচিত হয় ভারতীয় সভ্যতার প্রাথমিক বুনিয়াদ।

ধর্ম বিপ্লবের যুগ

বৈদিক যুগের পর ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মকেন্দ্রিক ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণে এ সময়টি 'ধর্ম বিপ্লবের যুগ' হিসেবে খ্যাত। ধর্মক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য, পুরোহিত শ্রেণীর কর্তৃত্ব, জীব হিংসা ও মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ধর্মের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকলে সমাজে ধর্মীয় বিপ্লব দেখা দেয়। জৈন ধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথ ও মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিরোধী এবং জীবহিংসার বিরোধী ও অহিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করে উদার ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন ধর্মমত প্রচার করেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে এই ধর্মীয় উদারতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন যুগে ভারতের শিল্প সাধনায় প্রেরণা যুগিয়েছে ভারতীয়দের ধর্ম ভাবনা। আর হয়তো সে কারণেই ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও প্রভাব যথেষ্ঠ, তাদের অবদানও অপরিসীম।

ধর্মক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য, পুরোহিত শ্রেণীর কর্তৃত্ব, জীব হিংসা ও মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ধর্মের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকলে সমাজে ধর্মীয় বিপ্লব দেখা দেয়

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সভ্যতার বিকাশ

এরপর খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' আরম্ভ হয় এবং মগধকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক তৎপরতার বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর পূর্বে ভারতে পারসিক ও ম্যাসিডোনীয় আক্রমণ সংগঠিত হয়। এসময় প্রখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণে পারসিক সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও ভারতের সঙ্গে পারস্যের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। পারস্য হতে বহু স্থপতি এসময় চলে আসেন ভারতে। মৌর্য শিল্পকলা এবং অশোকের স্তম্ভগুলিতে পারসিক প্রভাব লক্ষণীয়। অন্যদিকে ম্যাসিডোনের দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রিস ও ভারতের মধ্যেও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। ভারতের গান্ধার শিল্পরীতিতে গ্রিক প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির নাক, কান ও মাথার গঠনেও গ্রিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। মৌর্য শাসন ব্যবস্থা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান স্বীকার্য। মুদ্রা এবং কাঠের প্রাসাদ নির্মাণেও গ্রিক প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও এ সময় গ্রিকদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব গ্রিক চিন্তাবিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে জানা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' আরম্ভ হয় এবং মগধকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক তৎপরতার বিকাশ ঘটে

মৌর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি

ভারতে প্রথমবারের মতো বৃহৎ আকারে সাম্রাজ্য গঠনের কৃতিত্ব মৌর্যদের। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোক হচ্ছেন মৌর্য সাম্রাজ্যের কৃতি শাসক। কেবলমাত্র যুদ্ধ বিগ্রহই নয়, এঁদের শাসনকালে ভারতে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুবিন্যস্ত শাসন কাঠামো মৌর্য যুগের অবদান। একই সাথে শাসনকাঠামোর প্রধান লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ সাধন। মৌর্য ভূমি রাজস্ব নীতি এবং মৌর্য যুগের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেশ উন্নত। সামাজিক জীবনে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা হ্রাস, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি উন্নত সভ্যতারই ইঙ্গিতবাহী। কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' মৌর্য যুগের একটি বিখ্যাত সংযোজন। এই গ্রন্থকে সমকালীন ভারতের ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞানচর্চার এক দুর্লভ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও মৌর্যদের অবদান ব্যাপক। ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের প্রভূত অগ্রগতির সাক্ষ্য হিসেবে বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে মৌর্য যুগ থেকে। পাটলীপুত্রের স্থাপত্য, অশোকের প্রাসাদ ও স্তম্ভসমূহ, স্তূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ সময় ভারতে বেশ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। মৌর্য আমলে বিশেষ ধরনের মুদ্রা প্রকাশ এবং মৃৎ শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মৌর্য শিল্প ও ভাস্কর্য কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। মৌর্য শিল্পকলার মধ্যে জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য এবং অনার্য শিল্পরীতির মিশ্রণে মৌর্য শিল্পরীতি বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। পারসিক এবং গ্রিক শিল্পরীতিও মৌর্য রীতিতে কমবেশি প্রভাব ফেলেছে বলে অনেকের ধারণা। তবে মৌর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর খুবই অল্প প্রভাব রেখেছে বলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।

কুষাণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি

মৌর্য সাম্রাজ্যের পর কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় ইউফ্রেটিস হতে গঙ্গা নদী পর্যন্ত ভূ-ভাগ কুষাণ শাসনাধীন হলে ভারতে এক মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যকে আশ্রয় করে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এশিয়া, চিন ও তিব্বতে বিস্তার লাভ করে। রোমক সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের বাণিজ্য জলপথে ও স্থলপথে ব্যাপকতা লাভ করে। মোদ্দা কথা হলো, কুষাণ সম্রাটগণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে আস্থ করে বহির্দেশে তার প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। কুষাণ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয়করণ সম্পন্ন করেন। তিনি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ঘটান, প্রসার ঘটান বৌদ্ধধর্মের এবং শিক্ষা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমলে ব্যাকট্রীয় যুগে সূচিত গান্ধার শিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। গান্ধার শিল্পে গ্রিক ও ভারতীয় রীতির মিশ্রণে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা হতো। এছাড়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় মথুরা শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কুষাণ যুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পরীতির পাশাপাশি ব্যাকট্রীয় শিল্পরীতিরও উদ্ভব হয়েছিল। কুষাণ যুগের এই শিল্পকলায় জীবনবোধ এবং জনজীবনের স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশেষ করে গান্ধার শিল্পের কথা এ প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করতে হয়। এ শিল্পের পশ্চাতে ছিল ভারত-রোম বাণিজ্য। অনেকের মতে, গান্ধার শিল্প ছিল যান্ত্রিক এবং এতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুরাগী তাঁরা বলেন যে, গান্ধার শিল্প হচ্ছে প্রথম সার্থক ভারতীয় শিল্প। ভারতীয় বিষয়বস্তুতে পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগের পরীক্ষা গান্ধার শিল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়। কুষাণ যুগে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার ক্রমেই কমে আসতে থাকে এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতি ঘটে। এযুগেই বিশিষ্ঠ পন্ডিত অশ্বঘোষ রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত', 'বজ্রসূচী', 'সূত্রালংকার' ইত্যাদি গ্রন্থ। বিশিষ্ঠ দার্শনিক নাগার্জুন রচনা করেন 'প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্র' শাস্ত্র। বৌদ্ধ পন্ডিত বসুবন্ধু রচিত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি', ধর্মকীর্তি রচিত 'ন্যায়বিন্দু', দিঙনাগ রচিত 'প্রমাণ সমুচ্চয়' এবং চরক ও শুশ্রুত রচিত শরীরবিদ্যা ও ভেষজবিজ্ঞানের গ্রন্থ মৌর্য পরবর্তী ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। পুরুষপুর বা পেশোয়ার এবং তক্ষশীলাসহ আরো কয়েকটি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। সব মিলিয়ে একথা বলা যায় যে, কুষাণ আমলে ভারতে মহামতি অশোক নির্দেশিত অহিংসানীতির রাজসিক চর্চা হয়েছে, শিক্ষা, সাহিত্য এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে অগ্রগতি, রাজসভায় জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ দ্বারা উন্নত রুচির পরিচয় ঘটেছে এবং সর্বোপরি মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান -প্রদান সম্পন্ন হয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতির ইতিহাসে।

কুষাণ সম্রাটগণ ভারতীয় সংস্কৃতিকে আস্থ করে বহির্দেশে তার প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। কুষাণ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয়করণ সম্পন্ন করেন। তিনি অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ঘটান, প্রসার ঘটান বৌদ্ধধর্মের এবং শিক্ষা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন

গুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি

আপনারা ৯ এবং ১০ নং পাঠ হতে ইতোমধ্যেই গুপ্ত যুগে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিষয়ে অবহিত হয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে গুপ্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল কথাগুলি তুলে ধরা হলো। সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি গুপ্ত সম্রাটগণ মৌর্যদের মতোই শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। গুপ্ত শাসন ব্যবস্থার চরিত্র ছিল উদার। গুপ্ত যুগের প্রশংসনীয় একটি দিক হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও গুপ্ত শাসকদের ধর্মসহিষ্ণু আচরণ। এযুগের সাহিত্য ও দর্শনচর্চার অগ্রগতি রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। মহাকবি কালিদাসের নাটক ও কাব্য রচনা সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম সারিতে নিয়ে যায়, যা গুপ্ত যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। এছাড়া শূদ্রক, বরাহমিহির, বাগভট্ট, গৌড়পাদ, দন্ডিণ, অমরসিংহ, বিশাখদত্ত, ভারবি প্রমুখ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। এই উচ্চমার্গীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শিল্পকলা অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় গুপ্ত যুগ ছিল অসাধারণ সৃজনশীল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 'ধ্রূপদী সংস্কৃত' হিসেবে বিখ্যাত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 'ধ্রূপদী সংস্কৃত' হিসেবে বিখ্যাত

পুষ্যভূতি যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতের সর্বশেষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে পুষ্যভূতি রাজবংশ রাজ্য শাসন করেন। এঁদের শাসনামলেও জনমুখী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। পুষ্যভূতি শাসকরা নিয়মিতভাবে বুদ্ধিজীবী ও গুণীদের বৃত্তি, ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দান, রাস্তা-ঘাট তৈরি, খাল খনন, বিধবাদের বৃত্তি, অসহায় জনগণের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। হিউয়েন সাং সূত্রে হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে অতিশয়োক্তি থাকলেও সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় অবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে সেখানে ভুল তথ্য খুব একটা নেই। তিনি মহামতি অশোকের মতোই উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করেন। নিষিদ্ধ করেন জীবহত্যা। সবচেয়ে বড় কথা অতীতের মতো হর্ষও ছিলেন ধর্মসহিষ্ণু নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বাণভট্ট এযুগের উল্লেখযোগ্য লেখক। পুষ্যভূতি রাজবংশের শাসনামলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে একথা বলা যেতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন। আর্য আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; নগরকেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য আদি সভ্যতা কেন্দ্রসমূহের সমসাময়িকতা দান করেছে। আর্য আগমনের পর বৈদিক সভ্যতা সৃষ্টি করেছে নতুন স্রোতধারা। এই স্রোতধারায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম-সংস্কৃতি সংযোজিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা প্রবাহিত হয়েছে নতুন খাতে। মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত ও পুষ্যভূতি সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক বৈদেশিক প্রভাব আত্মস্থ করে। একই সাথে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে মধ্য এশিয়া, চিন এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। প্রতি যুগেই নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিল্পকলার বিভিন্ন অঙ্গনে। বিকাশ ঘটেছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে একথা বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক পরিমন্ডলে অবস্থানগত বাস্তবতায় ভারতবর্ষ সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজস্ব অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার কালে যে নগর সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সুপ্রাচীনতার পরিচয় বহন করে। এরপর বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে যে উদারতার সুর ধ্বনিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী অনেক হিন্দু শাসকও। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে। একই সাথে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে সাহিত্য ধারা। এই সব কিছু মিলিয়ে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাথমিক বুনিয়াদ রচিত হয়–
   ক. নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে।
   খ. কৃষির আবিষ্কারের মাধ্যমে।
   গ. আর্য-অনার্য সংস্কৃতির বিরোধ মিলনের মাধ্যমে।
   ঘ. মৌর্য ও গুপ্ত শাসকদের জনকল্যাণ সাধনের মাধ্যমে।

২। কুষাণ যুগের বিশিষ্ট পণ্ডিত–
   ক. কালিদাস।
   খ. হরিষেণ।
   গ. বাণভট্ট।
   ঘ. অশ্বঘোষ।

৩। 'ধর্ম বিপ্লবের যুগ' -এর প্রধান অবদান হচ্ছে–

ক. ধর্মীয় উদারতার প্রতি গুরুত্ব স্থাপন।
খ. ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি গুরুত্ব স্থাপন।
গ. রাজার উপর দেবত্ব স্থাপন।
ঘ. ধর্মক্ষেত্রে কঠোর বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন।

৪। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সাংস্কৃতিক ফল হচ্ছে–
ক. পারস্যের সাথে সংযোগ স্থাপন।
খ. গ্রিসের সাথে সাংস্কৃতিক লেনদেন।
গ. মধ্য এশিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন।
ঘ. পারস্যের সাথে সাংস্কৃতিক সন্ধি স্থাপন।

৫। গান্ধার ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে–
ক. পাশ্চাত্য বিষয়বস্তুতে ভারতীয় অলংকরণ।
খ. ভারতীয় বিষয়বস্তুতে পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগ।
গ. সার্থক ভারতীয় রীতির প্রয়োগ।
ঘ. সম্পূর্ণ গ্রিক অলংকরণের প্রয়োগ।

৬। মৌর্য শাসন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল–
ক. বিচার ব্যবস্থায় কঠোরতা আরোপ।
খ. শিল্পকলার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
গ. জনকল্যাণমুখী তৎপরতা বৃদ্ধি করা।
ঘ. বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

৭। গুপ্ত যুগের প্রধান প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে–
ক. স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অসাধারণত্ব।
খ. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি।
গ. গুপ্ত শাসকদের ধর্ম সহিষ্ণু আচরণ।
ঘ. গুপ্ত শাসকদের বিদ্যোৎসাহিতা।

৮। 'প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্র' রচনা করেন–
ক. ধর্মকীর্তি।
খ. অশ্বঘোষ।
গ. শূদ্রক।
ঘ. নাগার্জুন।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির আদিপর্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
২. "সিন্ধু-সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ" -ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা–সংস্কৃতির ইতিহাসে বৈদিক সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪. ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে 'ধর্ম বিপ্লবের যুগ' কোনটি নির্ণয় করুন।
৫. প্রাচীন ভারতে মৌর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
৬. গুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলকথাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৭ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কে ছিলেন? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।
২. ভারতের ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ধারণ করুন। তাঁকে 'মহামতি' বলা হয় কেন?
৩. অশোকের 'ধম্ম' বলতে কি বোঝায়? এই ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচারে তিনি কতোদূর সাফল্য অর্জন করেছিলেন?
৪. মানুষ ও শাসক হিসেবে অশোকের মূল্যায়ন করুন।

৫. কুষাণ কারা? কনিষ্ককে ‘কুষাণ শ্রেষ্ঠ’ বলা যায় কি?

৬. ‘এলাহাবাদ প্রশস্তি’র আলোকে সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৭. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। তিনিই কি ‘কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য’?

৮. ফা-হিয়েন কে ছিলেন? ফা-হিয়েনের বিবরণের আলোকে সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠন করুন।

৯. গুপ্ত আমলে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ পর্যালোচনা করুন।

১০. প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্তদের অবদান নিরূপণ করুন। কতোদূর পর্যন্ত গুপ্ত শিল্পকলার প্রসার ঘটেছিল?

১১. হর্ষবর্ধন কিভাবে থানেশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হন? তাঁকে কি ‘উত্তর ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট’ বলা যায়?

১২. মৌর্য-গুপ্ত যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৭.১	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. গ	৪. গ	৫. গ	৬. খ	৭. ক			
পাঠ ৭.২	ঃ	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক	৫. খ	৬. গ	৭. গ			
পাঠ ৭.৩	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ	৬. গ	৭. ক			
পাঠ ৭.৪	ঃ	১. খ	২. গ	৩. খ	৪. গ	৫. গ	৬. খ	৭. ঘ	৮. গ		
পাঠ ৭.৫	ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ			
পাঠ ৭.৬	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ			
পাঠ ৭.৭	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ	৬. গ				
পাঠ ৭.৮	ঃ	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ				
পাঠ ৭.৯	ঃ	১. গ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	৫. গ					
পাঠ ৭.১০	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. গ	৯. ঘ	১০. ঘ
পাঠ ৭.১১	ঃ	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. ক	৭. গ	৮. ঘ		
পাঠ ৭.১২	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. খ	৭. গ	৮. ঘ			